# অথ
# ভারত কথকতা

॥ প্রথম পর্ব ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী ( হ্যারিসন ) রোড
কলিকাতা ৯ ॥

॥ ৯ই আশ্বিন ১৩৬৪ ॥

॥ ১৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ ॥

প্রচ্ছদ ও চিত্রসজ্জা

॥ নীলরতন চট্টোপাধ্যায় ॥



মূল্য : দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

---

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১২ মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

## বিষয়-সূচী

# বিধাতার বিধিলিপি

এক যে ছিলেন রাজা। রাজার রাজ্য ছিল বিরাট, রাজপুরী ছিল বিরাট আর ধনদৌলত যে কত ছিল, তা রাজা নিজেই জানতেন না। কিন্তু হলে কি হয়, রাজার মনে সুখ ছিল না, মুখে হাসি ছিল না। দিনরাত তিনি গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতেন আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন: হায় রে! একটা ছেলে বা মেয়ে যদি থাকতো!

রাজ্যের লোকেরও কি এজন্যে দুঃখ কম ছিল! তারা খাটতো, খেতো আর মুখ আঁধার করে ঘুমোতো। আর রাজপুরী খাঁ-খাঁ করতো।

তারপর হঠাৎ একদিন রাজ্যময় মহা ধুমধাম পড়ে গেল। রাজপুরীতে সে কী আনন্দের হুল্লোড়! সারা দেশ জুড়ে শুধু উৎসব আর উৎসব!

কি ব্যাপার? না, রানীর এক ছেলে হয়েছে।

দুই হাতে রাজা ধনদৌলত বিলোতে লাগলেন।

রাজবাড়ির এক কোণে আঁতুড়ঘর। কিন্তু এমন করে সাজানো যে, না বললে তা ধরার উপায় নেই। মনে হয়, রাজবাড়ির মন্দির বুঝি।

আঁতুড়ঘরের দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছেন কে? ভাবছো বুঝি সিপাই শান্ত্রী কেউ? উঁহু। এমন কি রাজ্যের কোটাল বা মুখ্যমন্ত্রীও নন। পাহারা দিচ্ছেন স্বয়ং রাজার শ্যালক অর্থাৎ রানীর একমাত্র সহোদর ভাই। বিধাতাপুরুষ কখন আসবেন, সেই আশায় তিনি বসে আছেন।

মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্ট নিয়ে বিধাতাপুরুষের কারবার। মানুষ জন্মালেই তিনি নবজাতকের কপালে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ বা ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান—যাকে আমরা বলি অদৃষ্ট। বিধিলিপিও বলে কেউ কেউ। সবারই বিশ্বাস, জগতে সব এড়ানো গেলেও অদৃষ্ট এড়ানো যায় না, বিধিলিপি খণ্ডানোর সাধ্য কারো নেই। তাই বিধাতাকে সবাই সমীহ করে চলে—একমাত্র রাজার ওই শ্যালক ছাড়া।

বিধাতার এ ক্ষমতা রাজার শ্যালক মানেন না; বলেন, "যত সব বুজরুকি—মানুষকে ভয় দেখিয়ে বশে রাখার ফন্দি শুধু। বিধাতার মর্জির উপর মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার বুদ্ধি ও

অধ্যবসায়ের উপর। অদৃষ্টই বলো আর বিধিলিপিই বলো, চেষ্টা করলে মানুষ ওটা পালটাতে পারে।”

এর ফলে বিধাতাপুরুষ তাঁর উপর হাড়ে হাড়ে চটা। তিনি মনে মনে গজরান আর সুযোগের প্রতীক্ষা করেন, তাঁকে তাচ্ছিল্য করার মজাটা কখন ওঁকে টের পাইয়ে দেবেন।

রাজার শ্যালকও তা জানেন। তাই বোনের আঁতুড়ঘরের সামনে তিনি বিধাতার আশায় জেঁকে বসে আছেন সেই সন্ধ্যা থেকে।

অন্ধকার নিশুতি রাত। উৎসবক্লান্ত রাজপুরী ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সারা দেশ। একা ঠায় বসে থেকে থেকে রাজার শ্যালকের কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন সময় বিধাতা এসে হাজির। রাজার শ্যালককে দেখে রাগে তাঁর পিত্তনাড়ী জ্বলে গেল। পায়ে খড়ম—তবু পা টিপে টিপে সন্তর্পণে তিনি আঁতুড়ঘরে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ খুট করে একটু আওয়াজ হতেই রাজার শ্যালকের তন্দ্রা টুটে গেল।

চোখাচোখি হলো দুজনায়। রাজার শ্যালক মুচকি হেসে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বিধাতাপুরুষকে পথ করে দিলেন। আর কটমট করে তাকাতে তাকাতে বিধাতা ঢুকলেন ভিতরে।

ঘরের মধ্যে রানী তখন ছেলে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বিধাতাপুরুষ সন্তর্পণে ভাগ্যলিপি লিখলেন রাজকুমারের কপালে।

কাজ শেষ করে তিনি বেরোতে যাবেন, দেখেন, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে ওই হতভাগাটা আর মুচকি মুচকি হাসছে।

বিধাতা চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, “পথ ছাড়ো।”

রাজার শ্যালক বললেন, “তা ছাড়ছি। কিন্তু তার আগে আমাকে বলে যান, কুমারের কপালে কি লিখলেন।”

চোখ পাকিয়ে বিধাতা বললেন, "বটে ! তোমার কি দরকার ?"

রাজার শ্যালক হাসতে হাসতে বললেন, "বাঃ! বেশ প্রশ্নটা করলেন যা হোক ! আমি হলাম গিয়ে কুমারের মামা। দরকার আমার নয় তো কি আপনার ?"

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন, "শুনুন বিধাতা, ভাগনের অদৃষ্ট পালটানোর জন্যে আপনাকে কখনো অনুরোধ করবো না। আপনাকে শুধু বলে যেতে হবে, কি লিখলেন।"

বিধাতা দেখলেন, গোঁয়ারটার হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। অথচ দেরি করারও সময় নেই। আরো নানা জায়গায় অনেক কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া ও যখন অদৃষ্ট পালটানোর কথা বলছে না, তখন লিখন বলতে কি আর এমন আপত্তি !

রাজার শ্যালকের মুখের উপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, "বড় হলে তোমার ভাগনেটি চোর হবে। রোজ তাকে চুরি করতে হবে, নইলে দিনের খাবার জুটবে না। —বুঝলে ?"

ক্ষণেকের জন্যে রাজার শ্যালকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। 'ওঃ!' বলে বিধাতাপুরুষকে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন।

কিছুকাল পরে—

আবার রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়লো। রানীর আবার এক ছেলে হয়েছে।

আবার সেই আঁতুড়ঘর, আর তার দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছেন আর কেউ নন—রাজার শ্যালক। আগের মতোই নিশুতি রাতে বিধাতাপুরুষ এলেন আর মেজো কুমারের ভাগ্যলিপি লিখে, যাবার সময় রাজার শ্যালককে বলে গেলেন, "তোমার এই মেজো ভাগনেটিকে ভিক্ষে করে পেট চালাতে হবে। দৈনিক ভিক্ষে না করলে তার দিনের খাবার জুটবে না।"

আবার কিছু দিন পরে—

রাজ্যময় আবার ধুমধাম। রানীর আর এক ছেলে হয়েছে। নিশুতি রাতে বিধাতাপুরুষ আগের মতোই রাজার শ্যালককে জানিয়ে গেলেন, "তোমার এ ভাগনেটি রাখালগিরি করবে। দিনের খোরাক জুটোনোর জন্যে রোজ তাকে গোরু-মোষ চরাতে হবে।"

দিন যায়।

রাজপুরী জমজমাট। তিন ছেলে নিয়ে রাজা-রানীর হাসি ও আনন্দে দিন কাটে। কিন্তু হাসি নেই শুধু রাজার শ্যালকের। ব্যথার আগুন বুকে চেপে তিনি গুম হয়ে থাকেন।

আবার কিছুকাল পরে রাজ্য জুড়ে উৎসবের সাড়া জাগলো। এবার রানীর এক মেয়ে হয়েছে। গভীর রাতে বিধাতা রাজার শ্যালককে বললেন, "তোমার ভাগনীটিকে দাসীগিরি করে পেট চালাতে হবে। রোজ ঝিয়ের কাজ না করলে তার দিনের খোরাক জুটবে না।"

ক্রূর হেসে বিধাতা চলে গেলেন। আর তিন দিনের দিন ঘটলো মহা সর্বনাশ। রানী হঠাৎ মারা গেলেন।

রাজপুরী অন্ধকার হলো। রাজ্য জুড়ে শোকের ছায়া নামলো। রানীর শোকে রাজা তো উন্মাদের মতো। কোথায় গেল তাঁর রাজ্যশাসন! কোথায় রইল তাঁর ঘরসংসার, ছেলেমেয়ে! একদিন সব ফেলে তিনিও রানীকে অনুসরণ করলেন।

সুখের রাজসংসার দেখতে দেখতে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

বাপ-মা হারা ভাগনে-ভাগনীদের মুখ চেয়ে তাদের মামা অর্থাৎ রাজার শ্যালককে শেষ পর্যন্ত শোক ভুলতে হলো। চোখের জল মুছে রাজ্যের শাসনভার তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল। তেমনি তাঁর আদর-যত্নে রাজকুমারী

ও কুমাররাও বাবা-মা'র শোক ভুলে গেল অল্প দিনের মধ্যে। মামার সুশিক্ষায় তারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে লাগলো।

কত বছর কেটে গেল তারপর!

বড় রাজকুমারের বয়স তখন প্রায় সতেরো বছর। রাজকুমারী ও কুমারদের প্রশংসায় রাজ্যের সবাই শতমুখ। এমন সময় হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। মামা একদিন—বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ বড় রাজকুমারকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন; বললেন, "দূর হ এখান থেকে। নিজের পেটের ভাত নিজে যোগাড় করে খা গে যা।"

কাণ্ড দেখে মন্ত্রী, সভাসদ্, প্রজাবর্গ—সবাই স্তম্ভিত। কিন্তু টুঁ শব্দ করার কারো উপায় নেই। সব ক্ষমতা মামার মুঠোর মধ্যে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বড় কুমারকে রাজপ্রাসাদ ছাড়তে হলো।

কয়েক বছর পরে—মেজো রাজকুমার সবে তখন সতেরো বছরে পা দিয়েছে, এমন সময় মামা একদিন তাকেও তাড়িয়ে দিলেন রাজপুরী থেকে। বললেন, "দূর হয়ে যা এখান থেকে। নিজের পেট নিজে চালা গিয়ে।"

মামার নিন্দায় দেশ ভরে গেল। সবাই কাঁদলো কুমারদের জন্যে। ধরে নিল, ভাগনেদের তাড়িয়ে মামা সিংহাসনে বসতে চান।

এমনি করে সেজো কুমারও একদিন বিতাড়িত হলো। রাজকুমারীও নিস্তার পেল না। নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েগুলি কোথায় গেল, কেউ জানে না। সারা দেশ হায় হায় করতে লাগলো, আর রাক্ষুসে মামার উপর বিদ্বেষ ও ঘৃণায় সবার মন বিষিয়ে গেল। মামার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কড়া হাতে তিনি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

# বিধাতার বিধিলিপি

এমনিভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছরও কাটে প্রায়।

ভাগনে-ভাগনীরা কোথায় আছে, কিভাবে তাদের দিন কাটছে—মামা সে খবর রাখেন। এসব খবর তিনি সংগ্রহ করেন খুবই সংগোপনে।

একদিন শেষ রাত্রে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন রাজপুরী থেকে।

ঘুরতে ঘুরতে ভোরবেলায় তিনি এক জঙ্গলে এসে দেখেন, এক ঝোপের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বড় রাজকুমার। চেহারা তার কঙ্কালসার। চোখমুখ বসে গেছে। মাথাভরা রুক্ষ চুল—কত দিন যে তেলজল পড়ে না! কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ ফ্যাকাশে কালো হয়ে গেছে। আর সারা গায়ে ধুলোময়লা জমেছে কয়েক পরত।

মামা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা হলে রাজ-কুমারের ঘুম ভাঙলো। চুরি না করলে তার পেটের ভাত জোটে না। সারা রাত চুরির চেষ্টায় সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে, কিন্তু জোটে যৎসামান্য—কোনো রকমে দিন চলার মতো।

খিদেয় তাঁর পেটের নাড়ী যেন ছিঁড়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি ঝোপের ভিতর থেকে খানকয়েক ইট এনে উনুনের মতো করে তার উপর সে এক ভাঙা মেটে হাঁড়ি বসিয়ে দিল। তারপর একটা পুঁটুলি খুলে, তার থেকে হাঁড়িতে চাপিয়ে দিল দু মুঠো চাল আর কয়েকটা কাঁচা কলা। অনেক কষ্টে উনুন ধরিয়ে কাঠি দিয়ে হাঁড়ির চাল নাড়তে নাড়তে কুমারের চোখের জল আর বাধা মানে না। খিদেয় আর মনের কষ্টে সে কাঁদতে লাগলো আর অভিসম্পাত দিতে লাগলো মামাকে। এমন সময় হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই অস্ফুট আর্তনাদ করে সে লাফিয়ে উঠলো—যেন ভূত দেখেছে। সর্বনাশ! মামা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে!

আতঙ্কে তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। পালানোরও ক্ষমতা নেই। পা দুটো কে যেন সেঁটে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। বলির পাঁঠার মতো সে কাঁপতে লাগলো আর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল মামার মুখের দিকে।

মামা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ধরা গলায় বললেন, "কি হয়েছে, বাবা? অমন করছিস কেন? ভাবছিস বোধহয়, আমি তোর কোন অনিষ্ট করতে এসেছি? আরে বোকা, তা যদি হতো, তাহলে আজ কেন, অনেক আগেই তো সেটা করতে পারতুম! তুই কি মনে করিস, তোর কোন খবর আমি রাখি নি? তুই কোথায় আছিস, কি কষ্টে তোর দিন কাটছে—তা কি জানি নে, মনে করিস?"

রাজকুমার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কষ্ট! পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, গায়ে-মাথায় এক ফোঁটা তেল পড়ে না। সারা রাত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে একমুঠো অন্ন তাকে চুরি করে আনতে হয়! মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও নেই। কষ্ট!

মামাও চোখের জল রোধ করতে পারেন না। এত দিন চরের মুখে এদের খবর পেয়েছেন, এ চূড়ান্ত ভিখারীদশা স্বচক্ষে দেখেন নি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে তিনি বললেন, "কাঁদিস নে খোকা। তোর সঙ্গে জরুরী একটা কথা বলতে এসেছি। সেই মতো কাজ করলে, এ কষ্ট তোকে আর বেশী দিন সইতে হবে না।"

কান্না ভুলে কুমার তাকালো মামার মুখের দিকে। মামা বললেন, "শোন্, যা বলি সেই মতো তোকে কাজ করতে হবে। আগামী কাল থেকে তুই আর স্বেচ্ছায় চুরি করতে বেরোবি নে। পেট কি করে চলবে, তা তোকে ভাবতে হবে না। আহা, শোন্ শোন্, ওভাবে মাথা নাড়িস নে…"

উত্তেজিত কণ্ঠে কুমার কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মামা বললেন, "বাবা, একটিবার—শুধু এই একটিবার তুই আমার কথা শোন্, ভালো হবে। চুরি না করলে তোর পেট চলবে না, জানি। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা না করে দিলে নিজের ইচ্ছেয় তুই আর চুরি করতে বেরোবি নে—এইটেই শুধু আমার কথা। চুপচাপ এই গাছতলায় বসে থাকবি। তারপর দেখ, কি হয়।"

কিন্তু দিনের পর দিন মনে যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জমা হয়েছে মামার সম্পর্কে, তা কি সহজে যায়! অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত রাজকুমার রাজী হলো।

মামা এবার চললেন মেজো কুমারের খোঁজে। বেলা তখন দুপুর।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে এক গাঁয়ের সীমান্তে এসে হাজির হলেন তিনি।

দিন শেষ হয়ে আসছে। গাছের পাতায় পাতায় আলোর শেষ রক্তিমাভা পড়েছে। ডালে ডালে পাখির অশ্রান্ত কলগুঞ্জন, আর গোরু-মোষ নিয়ে রাখালেরা ঘরে ফিরছে।

মামা দেখলেন, বড় এক বটগাছের তলায় একটি ছেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে শুকনো ডালপাতা দিয়ে উনুন ধরানোর চেষ্টা করছে।

তিনি চিনতে পারলেন—সে মেজো কুমার। তারও অবস্থা হয়েছে বড় জনের মতো। চেনার উপায় নেই। সারা দিন ভিক্ষার আশায় সে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। দিনান্তে চালে ডালে মিশিয়ে যা জোটে, তাতে একবেলার খোরাক হয় কোনো রকমে। গাছতলায় সেই ভিক্ষান্ন সে ফুটিয়ে নেয়।

উনুন ধরানোর চেষ্টায় কুমার ব্যতিব্যস্ত। বাতাসে আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার। ধোঁয়ায় আর মনের কষ্টে সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। এমন সময় হঠাৎ পিছনে নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠলো—মামা!

মরি-বাঁচি করে সে জঙ্গলের দিকে ছুট দিতেই মামা তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর সে কী ধস্তাধস্তি! মামার কবল থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে, আঁচড়ে কামড়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতেও ছাড়ে না। আর মামা কেবলি বলেন, "খোকা, শোন্, শান্ত হয়ে শোন্ একটু।……ওঃ-হো-হো……বাবা, তোর কোন অনিষ্ট করতে আমি আসি নি। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, সে মতলব থাকলে আগেই তো তা করতে পারতুম……"

শেষ পর্যন্ত মেজো কুমার কিছুটা শান্ত হলে, মামা বললেন, "বাবা, তোর এ অবস্থা দেখার জন্যে আমি আসি নি। এসেছি, যাতে তোর এই কষ্ট শীগ্‌গির দূর হয়। কিন্তু সেজন্যে আমার পরামর্শ তোকে শুনতে হবে। শুনবি তো? কি, চুপ করে রইলি যে? বিশ্বাস হচ্ছে না,—না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "আমার পরামর্শ কি জানিস? কাল থেকে তুই আর স্বেচ্ছায় ভিক্ষের বেরোবি নে।"

"তাহলে কি না খেয়ে মরবো?"

মামা বললেন, "না। ভিক্ষে তোকে আরো কিছুদিন করতেই হবে। কিন্তু কেউ তার ব্যবস্থা না করে দিলে তুই নিজের ইচ্ছেয় করবি নে,—এইটুকুই আমার কথা।"

মেজো কুমার রাজী হলো শেষ পর্যন্ত।

আর অন্ধকার শীতের রাত্রে মামা আবার রওনা হলেন। চললেন সেজো ভাগনের কাছে।

দূর গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ি। গৃহস্থের গোয়ালের পাশেই বিচালির উপর চট বিছিয়ে সেজো কুমারের শোবার ব্যবস্থা। গোয়ালের সামনে আগুন জ্বেলে সে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করছে। মাঘের শীতে সারা রাত সে ঘুমোতে পারে না।

একরোখা গোঁয়ার বলে সবাই তাকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলে—এমন কি বাড়ির কর্তা-গিন্নী পর্যন্ত। আর অন্য রাখাল-ছেলেরা তাকে সমীহ করে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্যে।

নিঝুম গভীর রাত্রি। মামা ধীরে ধীরে আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেজো কুমার চমকে উঠলো, হাঁ করে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। পরক্ষণে, পাশে পড়েছিল বাঁশ একখানা, ধাঁ করে সেটা তুলে নিয়েই সে তড়াং করে উঠে দাঁড়ালো: তবে রে শয়তান! তোর মামাগিরি আজ ফলাবো। রাজ্য থেকে তাড়িয়েও সুখ নেই, এখানেও তাড়া করছিস!

সে শাসিয়ে উঠলো, "সাবধান! আর এক পা এগিয়েছিস কি, আস্ত রাখবো না।"

তারপর শুরু হলো গালাগালি। অকথ্য ভাষায় মামার চোদ্দ-পুরুষ সে উদ্ধার করে চললো।

কিন্তু একতরফা কতক্ষণ চলে! উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হতেই হঠাৎ তার খেয়াল হলো—তাই তো, কি ব্যাপার! মামা এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেন নি, চুপ করে তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখে বা হাবভাবে বদ মতলবের কোন লক্ষণ তো নজরে পড়ে না। বরং ব্যথায় সারা মুখ যেন থমথম করছে। তবে?

থতমত খেয়ে সে চুপ করে গেল।

তারপর অনেক কথা, অনেক তর্কাতর্কির পর সে কথা দিল—নিজের ইচ্ছায় এর পর থেকে সে আর কখনো রাখালের কাজ করবে না।

মামা আবার রওনা হলেন।

শেষ রাত্রি। পুব আকাশে শুকতারাটি শেষবারের মতো জ্বলে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। দু একটা কাক, শালিক আর নাম-না-জানা

দু একটা পাখি ঘুমজড়িত কণ্ঠে ভোরের আগমনী ঘোষণা করতেই রাজকুমারী ময়লা ছেঁড়া চটের উপর উঠে বসলো। না উঠে উপায় কি ? পেট চলবে কি করে ?

পরের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর নিকানো, ময়লা সাফ করা থেকে অজস্র ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে তার রাত দুপুর গড়িয়ে যায়। তারপরে বিশ্রাম। শেষ দিকে শরীর যেন আর বইতে চায় না। খাওয়াতেও রুচি থাকে না। আর ঝি-চাকরদের জন্যে সে কী খাওয়ার ব্যবস্থা ! প্রথম প্রথম সে তো মুখেই তুলতে পারতো না, বমি করে ফেলতো। তার উপর এই দারুণ শীতে সারা রাত ভালো ঘুমও হয় না। ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। তার কালিপড়া কঙ্কালসার চেহারা দেখে, কে বলবে সে রাজার নন্দিনী !

উজ্জ্বল শুকতারার দিকে রাজকুমারী তাকিয়ে থাকে। শুকতারা নীরবে জ্বলছে, নিভে আসছে একটু একটু করে। রাজকুমারীর চোখে অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে। দাদাদের সে যেন দেখতে পায়। তারা এখন কোথায় ? দুঃখে রাজকুমারীর বুক যেন ফেটে যায়। মামার আদর-স্নেহের কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু—কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল !

নিরালায় নীরবে রোজ কাঁদে রাজকুমারী। সেদিনও কাঁদছিল, এমন সময়—এ কী ! মামা !

তারপর নানা কথা······

রাজকুমারী কাঁদলো। মামাও কাঁদলেন। শেষে রাজকুমারী কথা দিল—স্বেচ্ছায় সে আর ঝিয়ের কাজ করবে না।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মামা ফিরে গেলেন রাজপুরীতে।

## বিধাতার বিধিলিপি

ভোরবেলা। বিধাতাপুরুষের বাড়ি।

চিরাচরিত অভ্যাসমতো বিধাতা প্রাতঃকৃত্যাদির আগে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছেন। আধবোজা চোখ, মুখে উদ্বেগ অশান্তির চিহ্নও নেই।

ফুড়ুৎ! ফুড়ুৎ!—এক মনে হুঁকো চলেছে। এমন সময়—এ্যাঁ!—চমকে উঠলেন বিধাতা, হুঁকোও আচমকা থেমে গেলঃ এ্যাঁ! টনক নড়ছে!

নড়েচড়ে বসে তিনি হুঁকোয় আবার দু চার টান দিতে না দিতেই, আবার টনক নড়ে উঠলো।

বিধাতার ভ্রূ কুঁচকে এলঃ এ্যাঁ, তাই তো! রাজার মেয়েটা ঘরে বসে আছে! ঝিয়ের কাজে বেরোনোর নাম নেই!

কয়েক মুহূর্ত তিনি হাঁ করে বসে রইলেন। তারপর বিরক্তির সঙ্গে হুঁকোয় ঠোঁটটা কেবল লাগাতে যাবেন, অমনি আবার টনক—এবার আরো জোরে।

বিধাতা সোজা হয়ে বসলেন জলচৌকির উপর। এ্যাঁ! আবাগীর বেটীর হলো কি! এখনো চুপ করে বসে আছে?

টনক কিন্তু তখন একভাবে নড়ে চলেছে। বিধাতা অস্থির হয়ে উঠলেন। দাঁড়িয়ে, বসে—কোনতায় সোয়াস্তি নেই তাঁর!

ঠাস করে হুঁকোটা ফেলে দিয়ে গজরাতে গজরাতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাড়ি থেকে।

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রাজকুমারী চুপ করে বসে আছে, এমন সময় ব্রাহ্মণের বেশে বিধাতা গিয়ে হাজির। অবাক হয়ে রাজকুমারী ছেঁড়া চট বিছিয়ে দিল অপরিচিত ব্রাহ্মণকে বসবার জন্যে।

আশীর্বাদ করে একথা-সেকথার পর বিধাতা মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তা মা, আজ তুমি কাজে বেরোবে না?"

"না।"

এ্যাঁ!—বিধাতার বুক ধড়াস করে উঠলো—"কেন মা, কি হয়েছে? কাজ না করলে কি করে তোমার পেট চলবে?"

রাজকুমারী বললে, "তা জানি নে। তবে ঝিয়ের কাজ আমি আর করবো না।"

বিপন্ন কণ্ঠে বিধাতা বললেন, "মা, তুমি তো বোকা নও। তবু কেন অবুঝের মতো কথা বলছো? অদৃষ্ট মা, অদৃষ্ট। নইলে তোমায় ঝিগিরি করতে হবে কেন? ওঠো মা—আর দেরি করো না।"

কিন্তু রাজকুমারী উঠলো না। যেমন ছিল, তেমনি হেঁট মুখে বসে রইল।

আর বিধাতা ঘামতে লাগলেন। এক-একবার তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল, হতচ্ছাড়া মেয়েটার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেন। কাজ করবে না!—মামাবাড়ির আবদার পেয়েছে?

অনেক কষ্টে মনের বেগ সংবরণ করে তিনি বললেন, "আচ্ছা মা, কেন কাজ করবে না, বলো তো? কি দুঃখ তোমার?"

রাজকুমারী বললে, "অতো কাজ আমি করতে পারি নে।"

বিধাতার বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। চাদরের খুঁটে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মুখে শুকনো হাসি টেনে বললেন, "ওঃ! এই কথা! তা আগে বললেই তো হয়। কিচ্ছু ভেবো না বাছা—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি, তোমার জন্যে এমন কাজ যোগাড় করে আনবো যে, খুব অল্প খাটলেই চলবে।"

বলতে বলতে বিধাতা রাজকুমারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারীকে নতুন কাজে লাগিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি ফিরলেন বাড়ির দিকে। মেজাজ তাঁর ভাল থাকার কথা নয়। এত বেলা হলো, প্রাতঃকৃত্যাদি সব পড়ে আছে।

তাই জোরে জোরেই পা ফেলছিলেন তিনি। এমন সময়—এ্যা! আবার টনক!

বিধাতার পা দুখানা যেন আপনা থেকেই থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টনকও আবার নড়ে উঠলো।

এঁ্যা! রাজার সেজো ছেলেটা এখনো রাখালের কাজে বেরোয় নি? চুপ করে গাছতলায় বসে আছে?

বাড়ি আর যাওয়া হলো না। বিধাতা দৌড়লেন সেজো কুমারের কাছে।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে সেজো কুমার বসে আছে। দূরে এক গাছের মাথায় এক ফিঙে পাখি বসে শিস দিচ্ছে। কুমার চেয়ে আছে সেই দিকে।

বট্‌টে!

অনেক কষ্টে রাগ দমন করতে করতে বিধাতা সেজো কুমারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বাবা, গাছতলায় বসে আছ যে? কাজে বেরোবে না?"

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে সেজো কুমার আবার নিজের কাজে মন দিল।

বিধাতা গরম হয়ে উঠলেন, "বলি বাপু, কথাটা কি কানে গেল? আজ গিলবে কি, শুনি?"

সেজো কুমারও চটে উঠলো, "তাতে তোমার কি হে বুড়ো? ভাগো—ভাগো বলছি এখান থেকে!"

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াতেই হা-হা করে বিধাতা তার হাত ধরে ফেললেন; বললেন, "আহা বাবা, চটো কেন? বুড়ো মানুষের কথায় কি চটতে আছে? পরের কষ্ট দেখতে পারি নে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—কাজ তো করতেই হবে, এভাবে বসে থাকলে চলবে কি

করে। আহা কচি বয়েস! আমায় বলো বাবা, কি তোমার অসুবিধে।”

কিন্তু সহজে কি নরম হয় গোঁয়ার ছোঁড়াটা! অনেক মিষ্টি কথার পর শেষে বললে, “অতো খেটে আমি পারি নে। একপাল গোরু-মোষ! একটা মুহূর্ত বিশ্রাম নেই।”

বিধাতা যেন বর্তে গেলেন, বললেন, “তাই বলো। আহা, সত্যিই তো! এই বয়সে অতো খেটে পারবে কেন? কিচ্ছু ভেবো না বাবা। একটু সবুর করো এখানে। তোমার জন্যে আমি এখ্‌খুনি ভাল কাজ যোগাড় করে আনছি।”

তারপর সেজো কুমারকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে বিধাতা যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন, তখন প্রায় দুপুর। দু পা হয়তো গিয়েছেন, এমন সময় আবার টনক নড়ে উঠলো।

এ্যাঁ! রাজার মেজো ছেলেটা বসে আছে? এখনো ভিক্ষেয় বেরোলো না! হতভাগাগুলো আজ ভাবলে কি?

কি ভাবলে—টনকের জ্বালায় বিধাতার তা ভাববারও অবসর হলো না। ছুটলেন তখ্‌খুনি।

সেই বটগাছতলা। মেজো কুমার মাথা হেঁট করে বসে এক মনে কাঠি দিয়ে মাটিতে কি সব দাগ কাটছে। বিধাতার ইচ্ছা হলো, ইট মেরে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেন। কাছে গিয়ে বললেন, “বলি ও বাপু, বসে বসে যে পণ্ডিতের মতো আঁক কষছো, আজ খাওয়া জুটবে কোত্থেকে শুনি?”

ধড়মড় করে উঠে মেজো কুমার তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, “তা কি করবো, বলুন? সারা দিন ভিক্ষে করে একবেলার খোরাকও জোটে না। তাই ভিক্ষে আর আমি করবো না।”

ছোঁড়াটার আস্পর্ধা দেখে বিধাতার মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠলো ; বললেন, "বটে ! কি করবে তাহলে ?"

চড়া গলায় মেজো কুমার বললে, "তাতে আপনার কি দরকার ? যান, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার সুর নেমে গেল, বললেন, "আহা, চটো কেন, বাবা ? না খেয়ে কষ্ট পাবে, এটা কি চলে কখনো ? ওঠো বাবা, ওঠো। ভিক্ষে না করলে যখন চলবে না, তখন যা হোক দুটো এনে ফুটিয়ে নাও।"

দৃঢ়কণ্ঠে মেজো কুমার বললে, "না ঠাকুর। ওভাবে ভিক্ষে করে আমি পারবো না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিভ বেরিয়ে যায়।"

বিধাতা বললেন, "আহা, সত্যিই তো ! যথার্থ কথাই বলেছো। তা বাবা, আমার সঙ্গে চলো। দেখবে, এমন ব্যবস্থা করে দেব, যাতে অল্প ঘুরলেই ভিক্ষে ঠিকমতো মিলে যায়।"

মেজো কুমারকে নিয়ে ভিক্ষায় বেরোলেন বিধাতা। ছাড়া যখন পেলেন, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। সারা দিন অস্নাত অভুক্ত, প্রাতঃকৃত্যাদি জপতপ সব মাথায় উঠেছে—শ্রান্তক্লান্ত দেহে ধুঁকতে ধুঁকতে তিনি বাড়ির দিকে চললেন।

সন্ধ্যার পর।

স্নানাহার সেরে নিশ্চিন্ত মনে বিধাতা হুঁকোটা নিয়ে কেবল বসেছেন, আরাম করে দু একটা জুতসই টান দিয়েছেন কেবল, এমন সময় হুঁকোটা হাত থেকে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে রয়ে গেল : আবার টনক নড়ছে !

এ্যা ! রাজার বড় ছেলেটা এখনো চুরি করতে বেরোলো না ? চুপচাপ বসে আছে ? ওদের আজ হলো কি—এ্যা ?

হুঁকো হাতে বিধাতা বসে রইলেন। কিন্তু টনক শুনবে কেন? শেষে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বিধাতা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

জঙ্গলের ধারে ঝোপের কাছে বড় কুমার বসে আছে। চারিদিকে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। এমন সময় খড়ম পায়ে ঠুক ঠুক করতে করতে বিধাতা গিয়ে হাজির।

সেরেছে!—চমকে উঠলো বড় কুমার। পরক্ষণেই ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

"আহা বাবা, করো কি, করো কি? শোনো, শোনো, ভয় নেই।" বলে চাপা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বিধাতাও ছুটলেন তার পিছনে। অন্ধকারে একটা খড়ম কোথায় যে ছিটকে গেল!

জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে বড়কুমার ফিরে দাঁড়ালো, বললে, "আয় দেখি, ট্যাঁ ফোঁ করবি তো শেষ করে দেব।"

পরক্ষণে বিধাতা গিয়ে হাজির। বুড়ো ব্রাহ্মণ দেখে রাজকুমার কতকটা আশ্বস্ত হলো; বললে, "বলো ঠাকুর, কিজন্যে এসেছো, চটপট বলে ফেল। চালাকি করেছো কি, এই দেখতে পাচ্ছ—"

হাঁপাতে হাঁপাতে হাত নেড়ে তাকে নিরস্ত করে বিধাতা বললেন, "একটু সবুর বাবা, একটু সবুর। বুড়ো মানুষ···"

তারপর দম নিয়ে বললেন, "বাবা, ভয় নেই, তোমার কোন অনিষ্ট করতে আমি আসি নি। শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি—সন্ধ্যের পরে রোজ তুমি কাজে বেরোও, আজ কেন বেরোলে না?"

কুমারের মুখ কালো হয়ে উঠলো। ঠিক মতো লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে সে বললে, "ঠাকুর, ভালো হবে না বলছি। কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।"

শীতের রাত্রে বিধাতা ঘেমে উঠলেন। বুঝলেন, অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষকে ভুল বুঝো না। তোমার ভাল ছাড়া কোন ক্ষতি করতে আমি আসি নি। যেভাবে হোক আমি জানি, তুটো ভাতের জন্যে কি হীন কাজ তোমায় করতে হচ্ছে!···আহা বাবা, শোনো, শোনো···"

বলতে বলতে তিনি কুমারের হাত তুটো চেপে ধরলেন, "বিশ্বাস করো বাবা, বিশ্বাস করো, কোন ক্ষতি করতে আমি আসি নি। আমার সঙ্গেও কেউ নেই। বাবা, বাধ্য হয়ে যে কাজ তুমি করছো, তাতে কোন পাপ নেই তোমার। আজ যে তুমি কাজে বেরোলে না, হয়তো মনে করছো ওতে তোমার পাপ হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়—তাই বলার জন্যেই আমি এসেছি।"

"কেন? এটা বলার জন্যে তোমার হঠাৎ এমন কি মাথাব্যথা পড়লো? তা যাই বলো না কেন ঠাকুর, ও কাজ আমি আর করবো না।"

"করবে না? কেন বাবা, কি হয়েছে?" সকাতরে বিধাতা জিজ্ঞেস করলেন।

"করবো না, আমার ইচ্ছে। তা জেনে, কি লাভ তোমার?"

তারপর নিজের মনেই সে বললে, "একটা কাজের আশায় বাড়ি বাড়ি কত ঘুরেছি। সবার কাজ জোটে, আর আমার কপালে একটা যেমন-তেমন কাজও জুটলো না। পেটের দায়ে আজ চুরি করতে হচ্ছে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ! সারা রাত বাড়ি বাড়ি হাতড়ে এক বেলার খোরাকও জোটে না, তার উপর ধরা পড়লে—ব্যস!"

ফোঁস করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুঢালা কণ্ঠে বিধাতা বললেন, "আহা রে! সত্যিই কী কষ্ট! কিন্তু বাবা, বিধাতার লিখন কে খণ্ডাবে, বল্? চুরি করাই যে তোর বিধিলিপি।"

রাজকুমার গর্জন করে উঠলো, "চুপ করো বুড়ো। বিধিলিপি? বিধাতা! একবার বিধাতার দেখা পেলে হতো। জিজ্ঞেস করতুম, কি পাপে আমার এই অবস্থা। জবাব না পেলে ঠেঙিয়ে তক্তা বানাতুম।"

বিধাতা সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। মুখে তাঁর রা নেই। শেষে ধীরে ধীরে বললেন, "বাবা, ওসব বলে কি লাভ? চুপ করে বসে থাকলে পেট তো শুনবে না। আমার কথা শোন্। আমি তোর সঙ্গে থাকবো। সহজে যাতে কাজ হাসিল হয়, তার সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে দেব। চল্ বাবা, চল্।"

কিন্তু সহজে কি রাজী হয় ছোকরাটা? তার পায়ে ধরা ছাড়া বিধাতা আর কিছু বাকি রাখলেন না। শেষে দুপুর রাতে তাকে নিয়ে বেরোলেন চুরি করতে।

তারপর রাতভোর চোরের শাগরেদি করে বিধাতা যখন বাড়ি ফিরলেন, পুব আকাশ তখন ফরসা হয়ে এসেছে।

বিধাতা-গিন্নীও ঘুমোন নি সারা রাত। বিধাতা ফিরতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁ গা, ব্যাপার কি বলো তো? সারা দিন সারা রাত তুমি কোথায় টো টো করে বেড়াচ্ছ?"

বিধাতা গুম হয়ে বসে রইলেন। উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা নয়। আর উত্তরই বা দেবেন কি ছাই! নিজের কাছেও কি কোন উত্তর আছে? ছিঃ ছিঃ। শেষকালে কিনা চোরের শাগরেদিও করতে হলো!

বিতৃষ্ণায় মুখ কুঁচকে তিনি উঠে পড়লেন। রাত শেষ হয়ে গেছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে।

জ্বলন্ত চোখে বিধাতা-গিন্নী তাকিয়ে রইলেন: বটে! উত্তর দেবারও দরকার মনে করো না?

স্নানাহ্নিক প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বিধাতা হুঁকো নিয়ে কেবল বসেছেন, মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা—জলচৌকির উপর বসে চোখ বুজে তিনি হুঁকো টানছেন আর ভাবছেন গত চব্বিশ ঘণ্টার কথা, এমন সময় হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: এ্যাঁ! আবার টনক? আবাগীর বেটী আজো চুপচাপ বসে আছে?

দড়ি থেকে চাদরখানা ছোঁ মেরে কাঁধে ফেলে খড়ম পায় দিতে দিতে বিধাতা তীরের মতো বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

তারপর আবার শুরু হলো গত দিনের কাজ।

দিনের কাজ শেষ করে আধমরা অবস্থায় বিধাতা যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। গিন্নী গুম হয়ে বসে আছেন।

গামছাখানা টেনে নিয়ে বিধাতা চট করে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে-বাইরে তাঁর সমান অবস্থা। সর্বশরীর ব্যথায় বিষ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। তার উপর গিন্নী তো একেবারে বারুদ !···হুঁ! বাইরে তো বেরোতে হয় না, তাই বুঝতে পারেন না — কত ধানে কত চাল !

স্নানাহ্নিক সেরে কোনো রকমে দুটো মুখে গুঁজে বিধাতা তামাক নিয়ে বসলেন। সংসারের উপর তাঁর আর এতটুকু আকর্ষণ নেই। চুলোয় যাক সব !

ঘুমে দু চোখ জড়িয়ে আসছে—আয়েশ করে বিধাতা হুঁকোটা কেবল মুখে তুলতে যাবেন, এমন সময় হাতের হুঁকো হাতে রইল, তিনি কাঠ হয়ে গেলেন : এ্যাঁ ! আবার টনক নড়ছে ? হতভাগা চোরটা আজো চুপচাপ বসে আছে !

লাফ মেরে বিধাতা বারান্দা থেকে নীচেয় পড়লেন, "তবে রে হতভাগা, দাঁড়া দেখাচ্ছি—আজ তোর একদিন কি আমার একদিন !"

বিধাতার কাণ্ড দেখে বিধাতা-গিন্নীও রেগে কাঠ হয়ে গেলেন : 'বটে ! এত বড় আস্পর্ধা ! এসো আজ ফিরে, দেখি তোমার একদিন কি আমার একদিন ! রোজ রোজ সন্ধ্যের পরে বেরিয়ে যাওয়া আর ফেরা সেই রাত শেষ করে ! বুড়ো বয়েসের দুর্মতি কি করে ভাঙতে হয়, দেখাচ্ছি।'

কোমরে কাপড় জড়িয়ে তিনি দরজা জুড়ে বসলেন।

বাড়ি ফিরতে বিধাতার রাত শেষ। চেহারা হয়েছে ঝড়-জলে ভেজা দাঁড়কাকের মতো। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। চোখ জবাফুলের মতো লাল। খড়ম জোড়া তিনি পথ থেকেই হাতে নিয়েছিলেন, পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতে যাবেন, দেখেন গিন্নী দরজা আগলে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন।

বিধাতার বিধিলিপি

গিন্নীর কোমরের দিকে নজর পড়তেই বিধাতা আর দাঁড়ালেন না। খড়ম চাদর ফেলে রেখে ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

বিনা তেল গামছায় স্নানাহ্নিক সেরে বিধাতা গুটি গুটি সোজা চলে গেলেন বারান্দায়। গিন্নীর তর্জন-গর্জন সমানে চলেছে। ভাল করে তামাক সেজে হুঁকোয় তিনি জুতসই দু এক টান দিয়েছেন কেবল, অমনি আবার সেই টনক!

এমনি করে দিনের পর দিন রোজই চলতে লাগলো সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

বিধাতার চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, গাল চুপসে গেছে, মুখ শুকিয়ে আমসি। চলতে গেলে তাঁর পা কাঁপে। তার উপর বুকের দোষও যেন জুটেছে। একটু আওয়াজ হলেই বুক ধড়ফড় করে। ঘরেও অশান্তি। গিন্নী সমানে হম্বিতম্বি করে চলেছেন। বিধাতার বুঝতে আর বাকি নেই—কার কারসাজিতে ঘটছে এসব, কত বড় শয়তান ওই মামাটা!

সমস্ত কর্ম তাঁর মাথায় উঠেছে। কত নবজাতকের অদৃষ্ট লেখা যে বাদ পড়লো, তার কি আর ইয়ত্তা আছে! কারো কাছে যে তিনি পরামর্শ নেবেন, তারও উপায় নেই। এ যে শুনবে, সে-ই হাসবে। গিন্নীকেও বলা চলে না।

বিধাতার অবস্থা খুব খারাপ।

তাঁর কান্না পায়—'হায় হায়! শেষে নিজের জালে নিজেই আটকা পড়লাম!'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি পথ চলেন। এই ক'দিনেই ও-ক্ষমতাটা তাঁর বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মনের জোর গিয়ে ঠেকেছে শূন্যের কোঠায়। বারে বারে ভাবেন তিনি, শয়তানটার সঙ্গে একটা মিটমাট করলে কেমন হয়? দেরি হলে সব জানাজানি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের কোথায় যেন খচখচ করে ওঠেঃ এঁঃ! বিধাতা হয়ে কিনা শেষ কালে তিনি এই করবেন? আর তা-ও কিনা ওই পাষণ্ডটার কাছে?

কিন্তু যত দিন যায়, খচখচানিটাও তত ভোঁতা হয়ে আসে। যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও সেদিন ভোর রাতে বাড়ি ফিরতে গিয়ে উবে গেল। ধুঁকতে ধুঁকতে চলছিলেন তিনি। পথের মোড় ঘুরতেই দেখেন—বঁটি হাতে গিন্নী বাড়ির দরজায় বসে আছেন, কোমরে আঁট করে কাপড় জড়ানো। যেমন দেখা, সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁকে তিনি উধাও।

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ তাঁর হুঁশ হলোঃ তাই তো, কোথায় চলেছেন? পা যে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে রাজপুরীর দিকে!

## বিধাতার বিধিলিপি

ভোরবেলা। মামা রাজোত্থানে পায়চারি করছেন।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। চারিদিকে ফুলের সমারোহ। কিন্তু মামার লক্ষ্য নেই কোন দিকে। নতদৃষ্টিতে তিনি পদচারণ করছেন। দুই হাত পিছনে—গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তেই তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না ঃ বিধাতা!

কিন্তু বিধাতার চেহারার দিকে নজর পড়তেই মুখে তাঁর হাসির ঝিলিক খেলে গেল। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন ভাগ্যবিধাতা, আসুন। কী সৌভাগ্য আমার! গরীবের কুটির আজ ধন্য হলো। বসুন, বসুন।"

বলতে বলতে পাশের বেদীর উপর বিধাতার আসন করে দিয়ে গলবস্ত্রে করজোড়ে বললেন, "আদেশ করুন প্রভু।"

ভক্তির এই উৎকট আতিশয্য দেখে বিধাতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি করে উঠলো। কিন্তু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে বললেন, 'বড় খুশী হলাম তোমার ব্যবহারে! রাজশ্যালকের উপযুক্ত ব্যবহারই বটে। এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, তোমার ভাগনে-ভাগনীদের খবরটা একবার নিয়ে যাই। তা কেমন আছে ওরা? ওদের তাড়িয়ে দিয়ে বেশ তো আরামে আছ দেখছি। ওদের কোন খবর-টবর রাখ?"

মুচকি হেসে মামা বললেন, "হতভাগাদের কথা আর কেন জিজ্ঞেস করেন বিধাতা? বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বলুন? যে-যার অদৃষ্টের ধাঁধায় ঘুরে মরছে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "প্রভু, যে যাই বলুক, আপনার কাছে আমার কিন্তু কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনার দয়াতেই তো আজ আমার এই রাজ্যভোগ! এজন্যে আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো। আচ্ছা বিধাতা, আপনার কি ঠিক মনে আছে, জন্মসময়ে আমার কপালে কি লিখেছিলেন?"

## বিধাতার বিধিলিপি

বিধাতা যেন ফেটে পড়লেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সগর্জনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, "বটে! এত আস্পর্ধা! আমার সঙ্গে ঠাট্টা? আচ্ছা, দেখে নেব।"

বলতে বলতে হনহন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। বাগান ছেড়ে কয়েক পা গিয়েছেন, হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে উঠলো। আবার টনক নড়ছে!

নিত্যকর্মের কথা মনে হতেই বিধাতার রাগ জল হয়ে গেল। পরক্ষণে এক পা দু পা করে আবার তিনি ফিরে চললেন রাজোদ্যানে।

মামা সাড়ম্বরে আবার অভ্যর্থনা শুরু করতেই বাধা দিয়ে বিধাতাপুরুষ ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "ওসব রাখো এখন, বলো কি হলে মিটমাট হয়।"

মামার চোখে জল, মুখে হাসি। আড়ালে চোখ মুছে হাসিমুখে বললেন, "আমি আর কি বলবো প্রভু, সদয় যখন হয়েছেন, তখন দুটো বর আমায় দিন। প্রথমতঃ, আমার চার ভাগনে ও ভাগনীর বিধিলিপি বদলে দিন। রাজার ছেলেমেয়ের উপযুক্ত হবে তারা, হবে ক্ষমতাবান সুখী সুন্দর ও ন্যায়পরায়ণ। দ্বিতীয়তঃ, আজ থেকে শুধু বিধিলিপিই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে না। জগতে এটা ঘোষিত হোক যে, পুরুষকার অর্থাৎ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মানুষ নিজের ভাগ্য গড়তে পারবে, বিধিলিপি পালটাতে পারবে।"

বিধাতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কী নিদারুণ শর্ত!

এদিকে টনক কিন্তু বার বার নড়ছে। চিন্তা করা দূরে থাক, বিধাতার স্থির হয়ে দাঁড়ানো দুষ্কর। বললেন, "তথাস্তু! আজ থেকে তা-ই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে টনক থেমে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরলেন বিধাতা।

আর মামা—বিধাতা চলে যেতেই—চীৎকার করতে করতে রাজোদ্যান থেকে বেরিয়ে রাজপুরী যেন মাতিয়ে তুললেন। ঘুম থেকে সবাইকে টেনে তুললেন তিনি। হঠাৎ যেন তাঁর যৌবনের উৎসাহ ফিরে এসেছে। তাঁর এই আকস্মিক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলে তটস্থ হয়ে উঠলো। মামার কিন্তু ওসব দিকে গ্রাহ্যই নেই। তাঁর হুকুমে রাজপুরীতে তখনই 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। তারপর সেই দিনই চার ভাগনে-ভাগনীকে তিনি মহাসমারোহে নিয়ে এলেন রাজপুরীতে।

এতকাল পরে সবাই সব কথা শুনলো। রাজ্যের লোক লজ্জায় ও অনুতাপে এত বড় মহত্ত্বের পায়ে মাথা হেঁট করলো। সজল চোখে ক্ষমা চাইল সবাই।

কিছুকাল পরে বড় কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে, সবাইকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে মামা একদিন বললেন, "এইবার তোরা আমায় বিদায় দে। সারা জীবন তো বিষয়-আশয়ে কাটলো, এবার পরকালের কথা একটু ভাবতে হবে।"

ভাগনে-ভাগনীদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তারা কেঁদে উঠলো। হায় হায় করতে করতে ছুটে এল রাজ্যের মানুষ। কিন্তু কোন কিছুই মামাকে নিরস্ত করতে পারলো না। সকলের কান্নার মাঝে এক কাপড়ে তিনি রাজপুরী ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেউ জানে না।

আর সেই থেকে মানুষের জীবনেও এল এক নতুন প্রভাত। মানুষ আর ভাগ্যের দাস রইল না। পুরুষকারই হলো তার জীবনের ধ্রুবতারা।

# অনাথ-সংবাদ

সেকালের বারাণসী। বারাণসীর অদূরে এক ছুতোর-পল্লী। নানারকম কাঠের জিনিস তৈরি করে ছুতোরদের সংসার চলে।

একদিন এক ছুতোর কুড়ুল, করাত নিয়ে বনে চলেছে কাঠ কাটতে। বনের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা সরু পথ। গাছ পরীক্ষা

করতে করতে নিবিষ্ট মনে ছুতোর চলেছে। এমন সময়—ও কী! ছুতোর থমকে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনলো, কোথা থেকে ভেসে আসছে এক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে সে এগিয়ে গেল।

সামনেই এক গর্ত। শব্দ আসছে তার ভিতর থেকে। শুয়োর-ছানার গলা মনে হয়। এক মুহূর্ত ছুতোর কি ভাবলো, তার পরেই নেমে পড়লো গর্তের মধ্যে।

সত্যিই তাই। অসহায় অবস্থায় এক শুয়োর-ছানা সেখানে পড়ে আছে। না খেতে পেয়ে ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাপ-মাকে হারিয়ে ক' দিন সে ওখানে পড়ে আছে, কে জানে!

আহা!

ছুতোর পরম যত্নে ছানাটিকে বুকে তুলে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি খানকয়েক কাঠ যোগাড় করে ফিরলো বাড়ির দিকে।

ছুতোর নিঃসন্তান। শুয়োর-ছানাটিকে সে লালনপালন করে নিজের ছেলের মতো ক'রে। আদর করে তার নাম রেখেছে 'অনাথ'। অনাথকে সে সব সময় চোখে চোখে রাখে। তার কখন কি বিপদ ঘটে, সেজন্যে ছুতোরের দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

অনাথ ক্রমেই বড় হয়। দেশের মানুষ—যে তাকে দেখে—সে-ই অবাক হয় আর বলাবলি করে, আর কত বড় হবে হে শুয়োরটা!

ছুতোরও অবাক হয়, আর ততই অঢেল মমতা দিয়ে অনাথকে সে আড়াল করতে চায় লোকের কুদৃষ্টি থেকে।

শেষ পর্যন্ত অনাথ এক মহাকায় বরাহ হয়ে দাঁড়ালো। যেমন প্রকাণ্ড তার শরীর, তেমনি ভয়ঙ্কর দুই বাঁকানো দাঁত—দেখলে বুক কাঁপে। গায়ের জোরও তার তেমনি। অন্য শুয়োর বা কুকুর-বিড়াল
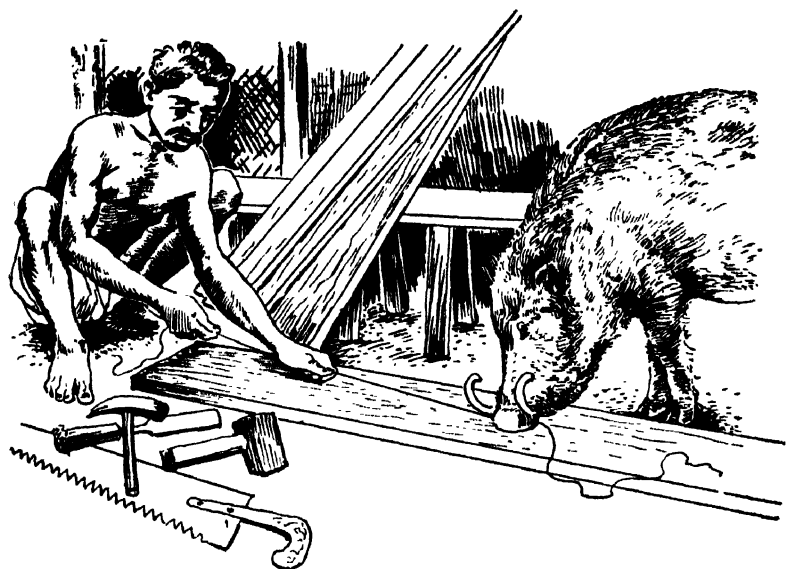
তো দূরের কথা, মোষের মতো বড় বড় জানোয়ারও ভয়ে তার কাছে ঘেঁষে না।

কিন্তু চেহারা ওরকম হলে কি হবে, অনাথের স্বভাব ভারি মিষ্টি। যেমন ধীর-শান্ত, তেমনি সে বুদ্ধিমান। কারো অনিষ্ট সে ভুলেও করে না। কোন কথা একবার বললেই বুঝে নেয়।

ছুতোরের পিছনে সে ঘোরে ছায়ার মতো, আর কাজে কর্মে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করে। সবাই জানে—যেখানে ছুতোর, সেখানেই অনাথ।

ছুতোর যখন কাঠের কাজ করে, অনাথ মুখ দিয়ে তখন তার যন্ত্রপাতি—বাইস, বাটালি, কুড়ুল, হাতুড়ি, মুগুর ইত্যাদি এগিয়ে দেয়। ছুতোর যখন সুতো দিয়ে কাঠের মাপ নেয়, অনাথ তখন সুতোর আর একটা দিক মুখ দিয়ে টেনে ধরে।

অনাথ এক দণ্ড চোখের আড়াল হলে ছুতোর জগৎ অন্ধকার দেখে। তার সব সময় ভয়, অনাথকে কেউ মেরে খেয়ে না ফেলে। গাঁয়ের বদ

লোকদের কানাঘুষো তার কানে এসেছে—তাদের নজর নাদুসনুদুস প্রকাণ্ড শুয়োরটার উপর। তাই অনাথের জন্যে দুশ্চিন্তায় তার রাতের ঘুম নষ্ট হবার মতো।

যত দিন যায়, নানাজনের নানান শলা-পরামর্শ ছুতোরের কানে আসে, আর ততই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তার বাড়তে থাকে। সে দিন-রাত ভাবে। কিন্তু ভেবে কূলকিনারা পায় না।

শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন সে মনস্থির করলো, "নাঃ! অনাথকে বনে ছেড়ে দেব। মানুষের সংসারে অনাথ বাঁচবে না।"

স্থির করলো বটে, কিন্তু মনের কথা মনেই থেকে যায়, কাজে আর হয়ে ওঠে না। চিরকালের জন্যে অনাথ চলে যাবে, ভাবতেই মন তার হু-হু করে ওঠে। 'আজ যাব', 'কাল যাব' করে তাই যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

কিন্তু এভাবেই বা ক' দিন চলে? অবস্থা শেষে এমনি ঘোরালো হয়ে উঠলো যে, যে-কোন সময় অনাথের বিপদ ঘটতে পারে।

তাই মন শক্ত করে ছুতোর একদিন অনাথকে নিয়ে রওনা হলো বনের দিকে। পথে যেতে যেতে নিজের মনে সে বকে চললো—অনাথকে কত উপদেশ দিল, কত রকমে তাকে সাবধান করলো। অনাথ কি বুঝলো, কে জানে!

বনের প্রান্তে এসে ছুতোরের চোখের জল আর বাধা মানে না। অনাথের গলা জড়িয়ে ধরে সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "বাপ, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানিস, আমার কতখানি তুই জুড়ে ছিলি। আজ তোরই মঙ্গলের জন্যে মানুষের মধ্যে তোকে রাখতে পারলাম না। আজ থেকে তোর ভার তোকেই নিতে হবে।"

তারপর আকাশের দিকে যুক্তকর তুলে ছুতোর কেঁদে উঠলো, "হে ভগবান! হে বনের দেবতা! কোনো ভাল কাজ আমি কোন দিন

যদি করে থাকি, তাহলে তার সবটুকু পুণ্য আজ অনাথকে দিলাম। দেখো দেবতা, ওর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

তারপর অনাথের মাথায় মুখে চুমু খেয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে তাকে সে বিদায় দিল।

অনাথ পালকপিতার মুখের দিকে ক্ষণেক তাকালো। একটিবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি যেন বলতে চাইল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রওনা হলো বনের দিকে।

গহন অরণ্যের ভিতর দিয়ে অনাথ চলেছে। ভয়-ডর কাকে বলে সে জানে না। তবু অপরিচিত দেশ, অজানা বনভূমি। পালকপিতার উপদেশ মতো সে এগোয় সতর্ক পদক্ষেপে—চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। নিরাপদে বাস করার মতো জায়গা সে খোঁজে, কিন্তু মনের মতো তেমন স্থান নজরে পড়ে না।

দূরে দেখা যায় এক পর্বতশ্রেণী—আকাশের গায়ে ঢেউ তুলে দিগন্তে মিশে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে অনাথ সেখানে এক পর্বতের নীচে এসে পৌঁছালো। পাহাড়ে ঘেরা এক পর্বত-উপত্যকা, ফুলে ফলে ভরা। পাশেই এক প্রকাণ্ড গুহা, বাস করা ও আত্মরক্ষার মতো উপযুক্ত জায়গা বটে। খাবারেরও কোন অভাব নেই। ফলমূল-কন্দের ছড়াছড়ি। প্রকৃতি যেন ছবির মতো করে সব কিছু সেখানে সাজিয়ে রেখেছে। জায়গাটা অনাথের বড় ভাল লাগলো। কিন্তু বড় নির্জন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবনের ছক আঁকছে, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই চকিতে সে ফিরে দাঁড়ালো।

অবাক কাণ্ড! কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে শুয়োরের পাল আসছে। বনের ভিতর থেকে, পাহাড়-পর্বতের আড়াল থেকে মেয়েমদ্দা, জোয়ান-বুড়ো কাচ্চাবাচ্চা দলে দলে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

অনাথ হতভম্ব। ফ্যাল ফ্যাল করে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো তাদের দিকে।

তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে তাদের সে অভ্যর্থনা জানালো, "এসো ভাই, এসো। ভাবছিলাম, একলা থাকবো কি করে। তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। মিলেমিশে সবাই একসঙ্গে থাকা যাবে। তা তোমরা থাকো কোথায় ?"

দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে দলের এক বুড়ো শুয়োর বললে, "ঐ ওখানে।"

তারপর আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলে অনাথ বললে, "কিন্তু ভাই, এ জায়গাটা দেখছি ভারি সুন্দর, আমার বড় পছন্দ হয়েছে। সবাই মিলে এখানেই যদি থাকি তো ক্ষতি কি ? তোমরা কি বলো ?"

সেই বুড়ো শুয়োরটা বললে, "জায়গাটা সুন্দর বটে, কিন্তু বাস করা চলে না—যথেষ্ট বিপদ এখানে।"

"বিপদ ?" অবাক হয়ে অনাথ জিজ্ঞেস করলে, "কিসের বিপদ ? তোমাদের দেখে অবিশ্যি আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। এমন সুন্দর জায়গা, এত খাবারদাবার ; তবু তোমাদের দেহ সব কঙ্কালসার, গায়ে যেন রক্তমাংস নেই। কেন বলো তো ? কিসের ভয় ?"

"বাঘের !" বুড়ো শুয়োর কাছে ঘেঁষে এসে বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, "সাংঘাতিক বাঘের অত্যাচার এখানে। বাঘ সকালবেলায় এসে যাকে পায়, তাকেই নিয়ে যায়। আমাদের কত মেয়েমদ্দা কাচ্চাবাচ্চা যে তার পেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কি করে যে বাঁচবো, জানি নে। পালিয়েও নিস্তার নেই। দুর্দান্ত জানোয়ার সেখানেও গিয়ে হাজির হয়। তাই কেঁদেই আমাদের দিন কাটে।"

বলতে বলতে বুড়ো শুয়োরের আর সেইসঙ্গে দলের আর সকলেরও চোখ ছলছল করে এল। অনাথ বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে জিজ্ঞেস করলে, "বাঘ কোন্ কোন্ দিন আসে ?"

"রোজই !"

"কয়টা আসে ?"

প্রশ্ন শুনে শুয়োরের পাল যেন শিউরে উঠলো, "কয়টা মানে ? একটার দাপটেই আমাদের এই অবস্থা। 'কয়টা' হলে শুয়োর-বংশে বাতি দেবার কেউ এত দিনে কি থাকতো, মনে করো ?"

অনাথ হাঁ করে ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বললে, "ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে ব্যাপারটা। বাঘ শুনছি একটা, আর তোমরা দেখছি এতজন—অথচ তার ভয়ে তোমরা এত অস্থির ! কেন বলো তো ? তোমরা সকলে মিলে কি একটা বাঘের সঙ্গে পেরে ওঠো না ?"

এবার শুয়োরদের বুঝতে না পারার পালা। অনাথের মুখের দিকে অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে তারা শেষে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো, "এ্যা ! ওটা পাগল নাকি ? বলে কি আবোল-তাবোল !"

দলের ভিতর থেকে একজন টিপ্পনী কাটলে, "আরে ধ্যেৎ ! ওর কথায় কান দাও কেন ? সারা জীবন যে মানুষের মধ্যে কাটালো, সে কি করে জানবে, বাঘ কাকে বলে। তাই তো অমন আবোল-তাবোল বকছে। শুয়োর কিনা বাধা দেবে বাঘকে ! ওটা একেবারে যা-তা !"

টিপ্পনী শুনে অনাথ যেন কেমন হয়ে যায়। চোখ দুটো বুঝি জ্বলে ওঠে একবার, তারপর সামলে নিয়ে ধীর সংযত কণ্ঠে সে বলে, "ভাই, তোমরা আমাকে যত অপদার্থই ভাবো, আমার কিছু বলার নেই। এর পর হয়তো চুপ করে চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল। কিন্তু তোমরা আমার স্বজাতি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী—বিষম বিপদের মধ্যে আছ। এত দিন তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় নি, জানতামও না কিছু—সে ছিল এক অবস্থা। কিন্তু আজ সব জেনে শুনে তোমাদের ফেলে চলে যাব, এত অপদার্থ আমি নই। ভাই, আমার কথাটা তোমরা একটু

ভেবে দেখো। আমরা এত জন, শক্তিমান জোয়ানের সংখ্যাও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট, তবু কেন একটামাত্র বাঘের সঙ্গে আমরা পারবো না? একজনের পক্ষে যা পারা অসম্ভব, একশো জন একসঙ্গে দাঁড়ালে আর মাথা খাটিয়ে চললে তা কি সহজেই পারা যায় না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে বুদ্ধি আর একতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই বাঘকে বাধা দিতে পারবো, বাঘ হেরে যাবে।"

অনাথের কথার আন্তরিকতা ও দৃঢ়তায় শুয়োরদের মধ্যে কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দেয়। সবাই চুপ করে থাকে, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা চলে। শেষে হঠাৎ একজন বলে উঠলো, "কিন্তু—যদি বাঘ না হারে?"

একটা উঁচু ঢিপির উপর উঠে অনাথ বললে, "তাতেই বা এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে আমাদের? এমনিতেই তো মরছি তার হাতে এবং মরবোও সবাই, হাজার কান্নাকাটি করলেও সে ছেড়ে দেবে না,—তখন সে যদি না-ই হারে তো, নতুন করে আমাদের কি আর এমন লোকসান হবে? কিন্তু আমার ধারণা, সে নিশ্চিত ভয় পাবে, হারবেও। কারণ এমন ঘটনা সে জীবনে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নি।"

দলের মাঝে এবার আলোড়ন শুরু হয়। বিশেষতঃ জোয়ান শুয়োরদের মনে অনাথের কথাটা বেশ দাগ কেটে যায়।

তারা বললে, "সত্যিই তো, কথাটা তো মিথ্যে নয়! নতুন ভায়া ঠিক কথাই বলছে। এমনিতেও বাঘের হাতে আমাদের মরতে হবে, তার চেয়ে সবাই মিলে লড়াই করে মরা অনেক ভাল। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?"

কিন্তু বৃদ্ধ প্রবীণদের মধ্যে দোমনা ভাব। জীবনে তারা কত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা তাদের কখনো হয় নি। তাই অনাথের কথায় তারা আস্থা রাখতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, "ধ্যেৎ ধ্যেৎ! গোঁয়ার-

গোবিন্দের কথায় বোকারাই নাচে। বাঘের কাছে কোন গোঁয়ারতমিই খাটে না। কেউ কখনো শুনেছে যে, শুয়োরের পাল লড়াই করেছে বাঘের সঙ্গে? ছোঃ!"

এমনি করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দলের মধ্যে চললো মতবিরোধ হইচই চেঁচামেচি। এক দিকে জোয়ানের দল, অন্য দিকে বুড়োরা। অনেকে আবার দোদুল্যমান, মনস্থির করতে পারে না। অনাথ প্রাণপণে বুঝায় সবাইকে।

শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক, আলোচনার পর তার যুক্তি ও আবেদনে বুড়োদের মন নরম হলো। সে বললে, "বন্ধুগণ, আপনারা একটু শুনুন—নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করলে আমাদেরই ক্ষতি, বাঘের তাতে আরো সুবিধে হবে। প্রবীণ বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই দরকার। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তাঁদের আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি—আজ যে কাজ আমি করতে বলছি, এত কাল তা কখনো ঘটে নি বলেই কি সেটা খারাপ হবে? না-ঘটার ফলে আমাদের ভাল কিছু হয়েছে কি? এত দিন তো বাঘকে বাধা দেওয়া হয় নি, আমরা নীরবে মরেছি, তবুও কি সে আমাদের কিছুমাত্র দয়া করেছে? এভাবে চুপ করে থাকলে আমরা একজনও কি বাঁচবো? তাই বৃদ্ধদের কাছে আমার আবেদন—হয় তাঁরা আমাদের সঠিক কোন বাঁচার পন্থা বলে দিন, নয়তো আসুন সবাই একসঙ্গে মিলে একমন হয়ে নিষ্ঠুর জানোয়ারটাকে বাধা দেই। আমি বলছি, তাতে ফল ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।"

অনাথের কথায় বুড়োরা সায় দিল। সবাই একমত হয়ে তাকে দলপতি নির্বাচন করলো।

সভা যখন ভাঙলো, পশ্চিম আকাশ আঁধার করে বনের বুকে তখন সাঁঝের ছায়া নামছে। স্থির হলো, সন্ধ্যার পরে আবার সবাই সেখানে এসে মিলিত হবে।

অস্পষ্ট জোছনায় বনের বুকে আবছা অন্ধকার। গুহার সামনে আবার সভা বসেছে। সবাই উপস্থিত। অনাথ তাদের শেখাচ্ছে—যুদ্ধ করতে হলে কিভাবে ব্যূহ রচনা করতে হয়, ব্যূহ না করলে কেন জয়লাভ অসম্ভব, কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় আর আক্রমণই বা করতে হয় কিভাবে। বিপুল উৎসাহে দলের মধ্যে চলেছে মহড়া আর আলোচনা, আলোচনা আর মহড়া।

শেষ কালে অনাথ বললে, “তোমরা তাহলে বুঝতে পারছো, আমরা যে ধরনের যুদ্ধ করবো, তাতে তিন রকমের ব্যূহ সুবিধাজনক ঃ পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ। আমরা পদ্মব্যূহ তৈরি করে শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করবো। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। এবার ভাল একটা জায়গা আমাদের বেছে নিতে হবে।”

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা জায়গা অনাথের বেশ পছন্দ হলো। সেখান থেকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ, দুই-ই ঠিকমতো চলতে পারে। সেখানে সে তৈরি করলো পদ্মব্যূহ—ঠিক যেন পাঁপড়ি-মেলা এক পদ্ম।

পদ্মের ঠিক মাঝখানে কেন্দ্রস্থলে রাখা হলো দুগ্ধপোষ্য কচি বাচ্চা আর তাদের মায়েদের। তাদের ঘিরে রইল প্রথমে বন্ধ্যা শুয়োরীর দল, তারপরে রইল যারা কিশোর, কিশোরদের ঘিরে দাঁড়ালো তরুণ যুবকেরা, তরুণদের পরে রইল মাঝারি আকারের সব দাঁতালো শুয়োর। আর সবার শেষে বাইরের সারিতে রইল সবচেয়ে বলবান সব যোদ্ধা সৈনিক-বাহিনী। দলপতি তাদের দরকার মতো কোথাও দশ-দশটা, কোথাও বিশ-বিশটা করে দাঁড় করিয়ে দিল। আর নিজে সে রইল সবার আগে। তার সামনে ও পিছনে অদ্ভুত দুটো গর্ত খোঁড়া হলো। সামনের গর্তটা গোল ও সোজা। কিন্তু পিছনেরটা বাঁকা ও গভীর—দেখতে কতকটা কুলোর মতো।

এই ভাবে বৃ্যহ তৈরি করে ও বাহিনী সাজিয়ে অনাথ ষাট-সত্তরটা জোয়ান শুয়োরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো, ব্যূহের কোন অংশে কোন অসুবিধা বা দুর্বলতা আছে কিনা। প্রত্যেককে সে আশ্বাস দিল, সাহস দিয়ে বললে, "বাঘকে দেখে কখ্খনো ঘাবড়ে যেও না। আমরা এত জন আজ একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি, বাঘের সাধ্য কি আমাদের ক্ষতি করে। মনে রেখো, আমরা একটা প্রাণী আজ এখান থেকে এক পা-ও পিছু হটবো না। আর তাহলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

শুয়োরদের মধ্যে যখন এই রকম কর্মচাঞ্চল্য চলেছে, তখন বাঘ কিন্তু পাহাড়ের ওপারে নিজের গুহায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিভোর। তার নাকের শব্দে গুহা গম্ গম্ করছে।

ভোর হলে সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। ক্ষিদেয় যেরকম পেট জ্বলছে, তাতে এক-আধটা শুয়োরে আজ আর চলবে না। বাঘের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো।

দ্রুতপদে সে রওনা হলো শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

দূর থেকে বাঘকে আসতে দেখে শুয়োরের দলে সাড়া পড়ে গেল, সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো, বাচ্চারা তো ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোলো। আর ভীতুর দল চেঁচাতে লাগলো, "সর্দার, সর্দার, বাঘ আসছে—বাঘ!"

অনাথ ব্যূহের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আবার সবাইকে অভয় দিয়ে, শেষে বললে, "শোনো, কয়েকটা সংকেত তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। সময় সময় আমি এইসব সংকেত করবো, আর তোমরাও তখ্খুনি সেই সংকেত মতো কাজ করবে। ভুল কোরো না যেন।"

বাঘ ততক্ষণে সামনের পর্বতের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে: ব্যাপার কি! শুয়োরের পাল দল বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে! তাকে দেখে পালানো দূরে থাক, একটু নড়ছে না পর্যন্ত! আজ হলো কি ওদের?

ভাল করে নজর করতে সে আরো অবাক হলো: ব্যূহ? শুয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে?

বাঘ একটু হকচকিয়ে গেল: ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

অন্য দিন হলে এতক্ষণে সে লাফিয়ে পড়তো শুয়োরদের মধ্যে, কিন্তু আজ একটু সাবধানে চলা দরকার।

ওদের দিকে সে তাকালো কটমট করে।

অনাথ সংকেত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরের দলও ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকালো বাঘের দিকে। কিন্তু তাদের বুক তখন ভয়ে দুরু দুরু করছে: এই বুঝি বাঘ রেগে দিল লাফ।

কিন্তু বাঘ আরো ঘাবড়ে গেল: তাই তো! হলো কি? চিরকাল যারা টুঁ শব্দ না করে পড়ে পড়ে মরলো, আজ তাদের হলো কি?

তবু, যেন কিছুই হয় নি, এমনিভাবে সে মস্ত এক হাই তুললো।

অনাথের সংকেত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরেরাও সশব্দে হাই ছাড়লো নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গী করে।

কী! শুয়োরে ভেংচি কাটছে!—বাঘ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু এগোতে সাহস হয় না। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে গোঁ গোঁ করে মারলো এক লাফ।

তৎক্ষণাৎ শুয়োরের পালেও সাড়া পড়ে গেল। ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দা, সবাই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে লাফিয়ে উঠলো। বাঘের হাবভাব দেখে ওদের তখন সাহস বেড়ে গেছে।

রাগে দিশেহারা হয়ে বাঘ এবার গর্জন করে উঠলো। ভয়ঙ্কর গর্জনে বনভূমি কেঁপে উঠলো, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে লাগলো তার প্রতিধ্বনি।

সে-গর্জনে শুয়োর তো দূরের কথা, বড় বড় জানোয়ার পর্যন্ত আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে পথ পায় না।

কিন্তু আজ পালানো দূরে থাক, শুয়োরের দলও সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। তাদের হাজার কণ্ঠের মিলিত হুঙ্কারে বাঘের গর্জন ডুবে গেল।

বাঘের বুক কেঁপে উঠলো। কোথায় উবে গেল তার শক্তি সাহস পরাক্রম। ভয়ে তখন তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে: যা অবস্থা দেখছে, তাতে ওদের পক্ষে দল বেঁধে তাকে আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়!

সুতরাং—

এক পা দু পা করে পিছু হটে পিছন ফিরেই বাঘ অদৃশ্য হলো পাহাড়ের আড়ালে।

শুয়োরের দলে আনন্দ যেন ফেটে পড়লো। তারা ভাবতেই পারে নি যে, এত সহজে বাঘ পালাবে। তাদের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে অরণ্য-পর্বত মুখরিত হয়ে উঠলো।

দলের আনন্দে অনাথেরও চোখমুখ উদ্ভাসিত। সবাই আজ সাহস ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর,—এ কি কম কথা!

বাঘ যেদিকে গেছে, সেদিকে চোখ রেখে হাসিমুখে অনাথ বললে, "ভাই, আনন্দে আত্মহারা হয়ো না। মনে রেখো, শত্রু এখনো অক্ষত দেহে বেঁচে আছে। আমাদের অসতর্ক দেখলেই সে আক্রমণ করবে। খুব সাবধান—ব্যূহ যেন না ভাঙে।"

গুটিসুটি মেরে বাঘ তখন নিজের বাসায় ফিরে চলেছে—চলেছে সন্ন্যাসীর কাছে পরামর্শ নিতে। যে গুহায় সে থাকে, তার কাছেই এক সন্ন্যাসী বাস করে। কিন্তু আসলে সে সন্ন্যাসীই নয়—সন্ন্যাসীর মুখোশপরা এক ভণ্ড প্রতারক। নিজের ভণ্ডামি ও শঠতা লুকোনোর

জন্যে সে মাথাভরা লম্বা জটাজুট আর গালভরা দাড়িগোঁফ রেখেছে। বাঘ দৈনিক যে শুয়োর মেরে আনে, তার একটা মোটা অংশ সে পায়। বাঘের সে পরামর্শদাতা। তাকে সে বুঝিয়েছে, কচি বাচ্চা আর বড় বড় মোটা শুয়োরের মাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু। বাঘ তাই রোজ বেছে বেছে শিশু আর জোয়ান শুয়োরদের হত্যা করে।

সেদিনও সন্ন্যাসী সকালবেলায় বাঘের পথ চেয়ে বসে আছে, এমন সময় শুকনো মুখে বাঘ ফিরে এল। সন্ন্যাসীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। খানিকক্ষণ হাঁ করে বাঘের দিকে চেয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করলে, "কী হে, ব্যাপার কি ? আজ খালি মুখে ফিরে এলে যে ? কোনো দিন তো এমন দেখি নি !"

বাঘ নির্বাক। মুখ নীচু করে বসে রইল। সন্ন্যাসী আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আরে কথা বলছো না কেন ? হয়েছে কি ? তোমার শুকনো মুখ আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, খুব ভয় পেয়ে গেছ। খুলে বলো, কি হয়েছে। বনে তোমার চেয়েও শক্তিমান কেউ এসেছে নাকি ?"

মুখ কাঁচুমাচু করে বাঘ তখন খুলে বললে সব কথা। বললে, "ঠাকুর, যে শুয়োরের পাল আমায় দেখলেই ভয়ে আধমরা হতো, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দিশে পেত না, আজ কিন্তু তাদের মধ্যে কি এক ব্যাপার ঘটে গেছে। আজ আমাকে দেখে পালানো দূরের কথা, ব্যূহ রচনা করে তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সে চেহারা দেখে আমার আর এগোনোর সাহস হলো না।"

সন্ন্যাসী যেন আকাশ থেকে পড়লো। জানোয়ারটা বলে কি ? শুয়োরের পাল ব্যূহ তৈরি করেছে ! আর তাই দেখে হতভাগাটা বাঘ হয়েও কিনা পালিয়ে এল ! অবস্থাটা কল্পনা করে হঠাৎ সে হেসে ফেললে। বললে, "তোমায় কি যে বলবো, ভেবে পাচ্ছি নে ! সত্যিই আমায় অবাক করেছো ! শুয়োরের ভয়ে বাঘ পালিয়ে এল, এমন

উদ্ভট কাণ্ড কোনো কালে কেউ শুনেছে? ছিঃ ছিঃ! ভাবতেও ঘেন্না করে।”

বাঘের বড় লজ্জা হলো। সত্যিই তো! হঠাৎ এভাবে পালিয়ে আসাটা তার পক্ষে খুবই খারাপ হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে সন্ন্যাসী আবার বললে, “আচ্ছা, পালিয়ে আসার আগে একবারও কি তোমার মনে হয় নি যে—তুমি বাঘ, বনের রাজা; তোমার ভয়ে বড় বড় জন্তু-জানোয়ার পালায়, শুয়োর তো কোন্ ছার? একবারও কি ভেবেছো, আজকের এই লজ্জাকর ঘটনা শুনলে বনের অন্য সব পশুরা কি ভাববে? আর কি তারা তোমায় গ্রাহ্য করবে?”

বাঘ আর সহ্য করতে পারছিল না। সামনের দুই থাবা জোড় করে বললে, “ঠাকুর, ক্ষমা দিন, আর বলবেন না। সত্যিই হঠাৎ একটা ঘেন্নার ব্যাপার ঘটে গেছে। শুয়োরদের লম্ফঝম্প দেখে আমার মাথাটা তখন কেমন যেন বিগড়ে গিয়েছিল। এখন বলুন, কি করতে হবে। আমায় ভয় দেখানোর মজাটা সুদে আসলে ওদের টের পাইয়ে দেব।”

বাঘের কথা শুনে সন্ন্যাসী মহাখুশী। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একগাল হেসে বললে, “বেশ বেশ, এই তো বাঘের মতো কথা! গতস্য শোচনা নাস্তি—যা হবার হয়ে গেছে। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোনো। এখুনি তুমি আবার ফিরে যাও। গিয়েই প্রথমে দেখবে, ওদের সর্দার কে। নিশ্চয়ই নতুন কোন শুয়োর এসেছে। তারই পরামর্শ মতো ওদের এত লম্ফঝম্প। গর্জন করে প্রথমে তারই ঘাড়ে তুমি লাফিয়ে পড়বে। তাহলে সে তো মরবেই, আর সেই সঙ্গে শুয়োরের পালও ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারে, ছুটে পালানোর পথ পাবে না। যাও। ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই।”

নতুন উৎসাহ নিয়ে বাঘ তখনি আবার রওনা হলো।

দূর থেকে তাকে আসতে দেখে শুয়োরেরা চেঁচিয়ে উঠলো, "সর্দার, দেখ দেখ, বাঘটা আবার ফিরে আসছে।"

অনাথ জানতো, বাঘ ফিরে আসবেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরবে, ভাবে নি। সে বুঝলো, বাঘের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার আর দেরি নেই। সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে নিজেও সে মনে মনে তৈরী হলো।

ইতিমধ্যে বাঘ এসে দাঁড়িয়েছে সামনের পর্বতের নীচে। একটু লক্ষ্য করতেই সে দেখলো, বিরাট এক দাঁতালো শুয়োর উঁচু একটা ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে অন্যদের কি যেন সব বলছে।

ওটাই তাহলে পালের গোদা—যত নষ্টের মূল ?

এমনিতেই বাঘ অপমানের জ্বালায় জ্বলছিল, তার উপর সর্দারকে দেখে বিষম রাগে সে গর্জন করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে প্রচণ্ড লাফ দিল অনাথকে লক্ষ্য করে।

অনাথ ইচ্ছা করেই বাঁকা গর্তটার কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল। বাঘকে লাফ দিতে দেখেই সে চোখের পলকে ঘাড় নীচু করে সামনের গোল গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেল। আর বাঘ নিজের বেগ সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বাঁকা গর্তের মধ্যে। অনেক ভেবে চিন্তেই অনাথ গর্তটা তৈরি করিয়েছিল। বাঘ তার মধ্যে এমনভাবে আটকে গেল যে, নড়াচড়ারও তার আর উপায় রইল না।

বিদ্যুদ্বেগে অনাথ গোল গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের উপর। বাঘের উরুতে দাঁত বসিয়ে তার তলপেট সে ফেঁড়ে ফেললে, তারপর দাঁত দিয়ে মাথার খুলি ভেঙে ফেলে তাকে গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, "এই নাও, যমের বাহনকে পাঠিয়ে দাও যমের কাছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় আক্রোশে শুয়োরের পাল ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর উপর।

তারপর শুয়োরের দলে সে কী বাঁধভাঙা আনন্দ-স্ফূর্তি! পাশে বসে অনাথ বিশ্রাম করছিল, তারও আনন্দের সীমা নেই। এমন সময় কয়েকটি বুড়ো শুয়োর এগিয়ে এল তার দিকে, সর্দারের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাদেরও অন্তর উদ্বেলিত, বললে, "সর্দার, সবাই আনন্দ করছে বটে, কিন্তু প্রধান বিপদ এখনো কাটে নি। বাঘ মরলেও আসল শত্রু এখনো বেঁচে আছে। ইচ্ছে করলে সে ওরকম দশটা বাঘ এনে হাজির করতে পারে। আনন্দের আতিশয্যে তার কথা ওরা ভুলে গেছে।"

অনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "সে কী! আসল শত্রু তাহলে বাঘ নয়? কে সে?"

বুড়োরা বললে, "সে এক ভণ্ড তপস্বী। মূর্তিমান শয়তান—মানুষের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তারই পরামর্শ মতো বাঘ আমাদের বড় বড় জোয়ান আর কচি বাচ্চাদের বেছে বেছে খুন করতো। সে-ই হলো বাঘের গুরু ও মন্ত্রণাদাতা। বাঘের গুহার কাছেই সে থাকে।"

"বটে! একথা আমায় আগেই বলা উচিত ছিল।" বলতে বলতে অনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লো, "বন্ধুগণ, আনন্দ করবার সময় এখনো আসে নি। তোমরা কি ভুলে গেলে, প্রধান শত্রু এখনো বেঁচে আছে? সে বেঁচে থাকতে আমাদের বিশ্রাম নেই। সেই ভণ্ড তপস্বীর সঙ্গে এবার আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে। এখ্খুনি যেতে হবে, সে যেন পালিয়ে না যায়।"

নিজের কুঁড়েয় বসে তপস্বী ভাবছিল। মনে তার নানারকম দুশ্চিন্তা জাগছে: বাঘের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কোনো ঝঞ্ঝাট বাধলো না তো?

তপস্বী আর স্থির থাকতে পারে না। এত বেলা হলো, ব্যাপারটি কি একবার দেখা দরকার। এক পা দু পা করে সে এগোলো শুয়োরদের আস্তানার দিকে।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই সে চমকে উঠলো—এ্যাঁ! কী ব্যাপার! শ'য়ে শ'য়ে শুয়োর আসছে? ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে? সর্বনাশ! ভয়ঙ্কর সব দাঁতালো শুয়োর!

আতঙ্কে তপস্বীর প্রাণ উড়ে গেল। পিছন ফিরেই সে দৌড়ল কুঁড়ের দিকে। তারপর চোখের নিমেষে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার দিল ছুট।···

আগে সন্ন্যাসী, পিছনে শুয়োরের দল। সন্ন্যাসী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে, আর পিছনে হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে আসছে শুয়োরের দল। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসে।

আর নিস্তার নেই! কাছেই ছিল এক যজ্ঞডুমুরের গাছ। তল্পিতল্পা ফেলে মরিবাঁচি করে সন্ন্যাসী তরতর করে তার আগডালে উঠে গেল।

শুয়োরের দল এসে দাঁড়ালো গাছতলায়।

এখন উপায়?

অনাথ বললে, "কোন চিন্তা নেই। গাছে উঠেও শয়তান নিস্তার পাবে না। যা বলি, সেইমতো কাজ করো।"

দলকে সে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে বললে, "শোনো, মেয়েরা জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালবে। ছোকরার দল গাছের গোড়ার সেই ভিজে মাটি খুঁড়বে। তারপর দাঁতালো জোয়ানেরা গাছের শিকড় কাটবে। বাদ বাকি সবাই গাছের চারদিক ঘিরে থাকবে, শয়তানটা যেন গাছ থেকে নেমে পালাতে না পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হলো।

······তেড়ে আসছে শুয়োরের দল। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসে। পৃঃ ৪৫ ॥

শুয়োরীর দল গাছের গোড়ায় জল দিতেই মাটি নরম হয়ে গেল। অমনি মহা উৎসাহে কাজে লাগলো ছোকরার দল। গোড়া খুঁড়ে ফেলতেই শিকড় বেরিয়ে পড়লো।

গাছের উপরে সন্ন্যাসীর চোখ তখন আতঙ্কে কপালে উঠে গেছে।

এবার এগিয়ে এল দাঁতালো জোয়ানেরা। তাদের দাঁতের এক-একটা ঘায়ে গাছ থরথর করে কেঁপে ওঠে, আর এক-একটা শিকড় কাটা যায়। গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে সন্ন্যাসী তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে, আর আকুল হয়ে ডাকছে ভগবানকে।

একে একে সব শিকড় কাটা হয়ে যায়। কিন্তু মূল শিকড়টা বেশ মোটা, কেউ আর কাটতে পারে না।

অনাথ এতক্ষণ সকলের কাজের তদারক করছিল। এবার সে এগিয়ে এল। তারপর লোকে যেমন কুড়ুলের কোপ মারে গাছের গোড়ায়, তেমনিভাবে ছুটে গিয়ে সে দাঁতের ঘা মারলো শিকড়ের উপর। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে শিকড় দু খান।

মড়মড় শব্দে গাছ ভেঙে পড়লো। আর্তনাদ করে উঠলো সন্ন্যাসী। চোখের পলকে শুয়োরের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। দেখতে দেখতে বাঘের মতো সন্ন্যাসীও নিশ্চিহ্ন।

তারপর!

পরম স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো শুয়োরদের মধ্যে। দলপতি অনাথের নেতৃত্বে এবার থেকে তাদের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন—ভাবনা নেই, কান্না নেই, শুধু নাচ আর গান আর আনন্দ-স্ফূর্তি।

# মিত্রবিন্দক

নানা জাতের ভিক্ষুকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে—কাশীরাজ্যের সে এক বিচিত্র উপনিবেশ। বাসিন্দারা সবাই ভিক্ষুক।

অদ্ভুত এ উপনিবেশ—যেমন নোংরা, তেমনি দুঃস্থ। রোগে শোকে আর অভাবের তাড়নায় অবিরাম যেন ধুঁকছে। তার উপর, এত দিন সেখানে যেটুকু বা শান্তি ছিল, আজ তা-ও নেই। হতভাগা ওই ছেলেটির জ্বালায় সারাক্ষণ হইচই মারামারি লেগেই আছে। কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। উপনিবেশের অন্য সব ছেলেমেয়েরা তাকে ভয় করে যমের মতো।

## মিত্রবিন্দক

বাবা-মা আদর করে তার নাম রেখেছিল মিত্রবিন্দক। কিন্তু কেন কে জানে—মিত্রবিন্দকের জন্মের পর থেকে তাদের সংসারে দুঃখকষ্ট-অভাবের যেন শেষ নেই। আগে ভিক্ষা যতই কম জুটুক, দু বেলা দু মুঠো অন্নের অভাব কখনো হতো না। কিন্তু ছেলের জন্মের পর থেকে প্রায়ই তাদের আধপেটা দিন কাটে, মাঝে মাঝে নিরম্বু উপবাসেও থাকতে হয়। তার উপর ভিক্ষার সময় মিত্রবিন্দক সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই, শত চেষ্টাতেও একমুঠো ভিক্ষা জোটে না।

কিন্তু তাতেও দুঃখ ছিল না, ছেলে যদি ওরকম না হতো। মিত্রবিন্দক যেন জন্মবিদ্রোহী—যেমন ডানপিটে, তেমনি দুর্দান্ত। কেউ তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। বলে, 'ছেলেটা জন্মঅভাগা, অলক্ষুনে। অমঙ্গল ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।'

বাবা-মা ছেলেকে কত বুঝায়, উপদেশ দেয়, সময় সময় শাসনও করে। শেষে নিজের মনকে তারা প্রবোধ দেয়—'আহা, হাজার হোক ছেলেমানুষ! বড় হলে সব শুধরে যাবে।'

কিন্তু শোধরানো তো দূরের কথা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রবিন্দক আরো দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি সে স্বার্থপর। নিজে সে কোনো দিন পেট ভরে খেতে পায় নি, তবু অন্যের দুঃখকষ্ট-অভাবে তার এতটুকু দয়া হয় না, উলটে পরের মুখের গ্রাস মেরে ধরে কেড়ে খায়।

আর সারা উপনিবেশ জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলে। এমন দিন নেই, ছেলের জন্যে বাবা-মাকে অপমান সহ্য করতে না হয়।

বাবা এক একদিন ছেলেকে মেরে আধমরা করে। মিত্রবিন্দকের চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়ে না, গলা দিয়ে একটু শব্দ বেরোয় না। শেষ পর্যন্ত মা আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীর হাত থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। চোখের জল মুছতে মুছতে

ছেলেকে কোলের কাছে বসিয়ে তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার কপালের উপর থেকে উদ্ধত চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "তুই কি শান্ত হবি নে, বাবা? এত বড় হলি, আর কবে তোর সুবুদ্ধি হবে? দেখছিস তো, তোর জন্যে কত অপমান আমাদের? যে যা মুখে আসে, তাই বলে যায়। বল্ তো বাবা, এভাবে কি করে চলে? আমার গা ছুঁয়ে আজ তুই প্রতিজ্ঞা কর্, আর কখনো এমন কাজ করবি নে। বল্, বাবা ······"

মায়ের কোলে মাথা রেখে মিত্রবিন্দক চুপ করে শুয়ে থাকে। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে হিংস্র শ্বাপদের মতো। মা নিজের মনে বকে যায়। ছেলের কানে তার কতটুকু ঢোকে, ভগবানই জানেন। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন তাকে দেখে মনেই হয় না, আগের দিন গুরুতর কোন কিছু ঘটেছে।

কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলে!

সেদিন এক প্রতিবেশীর ঘরে পিঠে হয়েছিল। ছেলেমেয়ে দুটি কতদিন থেকে আবদার ধরেছে, পিঠে খাবে। বাবা-মা তাই কম খেয়ে অতি কষ্টে ভিক্ষার চাল থেকে কিছু কিছু জমিয়ে সেদিন পিঠে

ছেলেমেয়ে দুটি এতক্ষণ নেচেকুঁদে আনন্দে বাড়ি মাথায় করছিল। পিঠে হতেই দু জনে পিঠে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলো। খুশিতে ভাইবোন যেন উপচে পড়ছে। এমন সময় কোথায় ছিল মিত্রবিন্দক, বাঘের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর। ভাইবোন চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। বাধা দিতে গিয়ে পিঠে তো গেলই, উলটে দু জনে জখমও হলো একটু; এবং অবস্থা চরমে উঠলো, যখন ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ক্ষিপ্ত উপনিবেশ এসে চড়াও হলো মিত্রবিন্দকের বাবা-মার উপর।

## মিত্রবিন্দক

**হতভাগা ছেলেটার জন্যে এত অপমান আর কাহাতক সহ্য হয়। বেদম মারতে মারতে বাবা ছেলেকে দূর করে দিল বাড়ি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উপনিবেশও তাকে তাড়া করলো কুকুরের মতো। মুহূর্তের জন্যেও সে কোথাও তিষ্ঠোতে পারলে না।**

বিতাড়িত মিত্রবিন্দক পথে এসে দাঁড়ায়। সারা অঙ্গে তার প্রহারের জ্বালা। শুধু কি বাবাই মেরেছে! ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাকে তাড়া করেছিল উপনিবেশের ছেলেবুড়ো—সবাই। ঢিলের ঘায়ে মাথা কেটে রক্ত ঝরছে কয়েক জায়গা থেকে।

সামনে প্রসারিত আঁকাবাঁকা পথ। অজানা শঙ্কায় কিশোরের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কোথায় গেছে ও পথ? ত্রস্ত চকিত চোখে সে তাকালো পিছনে—দূরে যেখানে দেখা যায় উপনিবেশ।

শ্রাবণের অপরাহ্ণ। মেঘে আকাশ থমথম করছে। বর্ষণক্লান্ত ধূসর দিগন্ত। উপনিবেশের মাথায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ভ্রূকুটি। আবছা উপনিবেশ যেন দাঁতে দাঁত চেপে ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এমন সময় আচমকা চারিদিক কাঁপিয়ে আকাশ গর্জন করে উঠলো। চমকে উঠলো মিত্রবিন্দক। আতঙ্কিত বালকের মনে হলো, উপনিবেশই বুঝি গর্জন করে ছুটে আসছে তার দিকে। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে সে ছুটলো পথ বেয়ে।

অজানা পৃথিবীর বুকে শুরু হলো নিঃসঙ্গ কিশোরের পথ চলা।

তারপর কত দিন কেটে যায়।

কত দেশ পিছনে ফেলে মিত্রবিন্দক চলেছে। অজানা দেশ। অজানা পথঘাট। মানুষও অজানা। মরণ যেন পথের বাঁকে বাঁকে

ওত পেতে থাকে। সময় সময় অন্নের জন্যে সে মরতে মরতে বেঁচে যায়। পথে কখনো সাথী জোটে। কখনো একলা।

সময় সময় তার পথ যায় ভয়ঙ্কর মরুর ভিতর দিয়ে। বালিয়াড়ির সীমাহীন স্তব্ধতায় বালক পথ হারায়। এক ফোঁটা জলের জন্যে আর্তনাদ করে।

সময় সময় বনের মাঝে সন্ধ্যা নামে। নিষ্কম্প বনের বুকে নামে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আতঙ্কে উপবাসী বালক গাছের মাথায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। গভীর রাতে বনের বুকে কারা যেন ছায়ার মতো আনাগোনা করে। তাদের হাঁকডাক হুঙ্কারে সারা বন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে মিত্রবিন্দক গাছের ডাল জড়িয়ে থাকে। স্বপ্নের মতো তার মনে পড়ে বাবা-মার কথা—সেই পুরনো দিনের স্মৃতি। মার কথা মনে পড়ে বারবার।

গ্রামে গ্রামে সে ভিক্ষা করে। কখনো বা হাতে-পায়ে ধরে গৃহস্থ বাড়িতে দাসের কাজ নেয়। কখনো আবার দিনমজুরিও করে। কিন্তু স্থায়ী আশ্রয় মেলে না কোথাও। সময় সময় কোন কাজ জোটে না। ভিক্ষাও মেলে না। গৃহস্থ বাড়ির আঙিনার পাশে বা গাছতলায় সে পড়ে থাকে অবসন্নের মতো।

সময় সময় নটের দলের সঙ্গে তার দেখা হয়। আমোদে-উৎসবে নটেরা নানারকম খেলা দেখায়—নাচগান, ভোজবাজি দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। তাদের দলে মিশে মিত্রবিন্দকও ঘোরে দেশে দেশে।

একদিন আবার সে আশ্রয়ও টুটে যায়। আবার শুরু হয় তার একলা পথ-চলা।

এমনি করে দিন মাস বছর কেটে যায়। পৃথিবীতে কোথাও দাঁড়াবার মতো এতটুকু আশ্রয় সে খুঁজে পায় না। মানুষের সংসারে স্নেহকাঙাল মন তার মাথা কুঁটে মরে।

সেদিন এক জনবিরল দেশের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। কোন্ সকালে পিছনে ছেড়ে এসেছে শেষ লোকালয়। তারপর মানুষের বসতি আর চোখে পড়লো না কোথাও।

সূর্য অস্তে চলেছে—দিন শেষ হতে আর দেরি নেই। মিত্রবিন্দক ছুটতে শুরু করলো। বিজন দেশে রাতের আতঙ্ক তাকে যেন পেয়ে বসে।

হঠাৎ পথের এক মোড় ঘুরতেই সে থমকে দাঁড়ালো। পথের পাশে অনেক তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর ভিতরে বাইরে বহু লোকজন, আর তাঁবুগুলিকে ঘিরে দুর্গের মতো সাজানো রয়েছে অসংখ্য গরুর গাড়ি।

কারা ওরা? বণিক?

মিত্রবিন্দক পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, বণিকই বটে। দূর বারাণসী নগরে তারা বাণিজ্য করতে চলেছে। সঙ্গে মূল্যবান অজস্র পণ্যসম্ভার। তাই দস্যু-তস্করের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে তারা পথ চলে।

মিত্রবিন্দক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

তাঁবুগুলির মাঝখানে বড় এক তাঁবুর সামনে বসে দলপতি সার্থবাহ কথা কইছিলেন দলের কয়েকজন বণিকের সঙ্গে, এমন সময় মিত্রবিন্দক তাঁর সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।

নির্জন দেশে দীনহীন কিশোর বালককে দেখে তারা অবাক। করুণ কণ্ঠে মিত্রবিন্দক বললে, "একটু আশ্রয় দিন আমায়। আমার কেউ নেই, আশ্রয়ও নেই কোথাও। এই বিজন দেশে রাত হয়ে আসছে। আমি কোথায় যাব? আপনাদের সব কাজ আমি করে দেব, শুধু দু বেলা দু মুঠো খেতে দেবেন। দয়া করুন আমাকে।"

বণিকেরা না করতে পারলে না। সার্থবাহের দয়ায় মিত্রবিন্দক আশ্রয় পেল।

তারপর একদিন বণিকের দল এসে পৌঁছালো বারাণসী নগরে। বণিকদের আশ্রয় মিত্রবিন্দকের আর ভাল লাগছিল না। নগরে পৌঁছে গোপনে সে একদিন ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলো।

কিন্তু স্বভাবদোষে তার আশ্রয় মিললো না কোথাও। অনাহারে অর্ধাহারে ভিক্ষা করে বারাণসীর পথে পথে সে ঘুরতে লাগলো।

কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী। অনাথ-আতুরের সেখানে সেবার অভাব নেই। নাগরিকদের অকৃপণ দানে কত অনাথ-আশ্রম চলে। নিরাশ্রয় অনাথ ছেলেদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে সেখানে।

এমনি এক আশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন বোধিসত্ত্ব। আত্মভোলা আচার্যের প্রতি বারাণসীর ধনী-দরিদ্র বালকবৃদ্ধ সকলের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। আচার্যের স্নেহচ্ছায়াতলে পাঁচশো অনাথ ছেলে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া শিখতো।

ঘুরতে ঘুরতে নানা ঘটনাচক্রে একদিন মিত্রবিন্দক এসে উপস্থিত হলো সেই আশ্রমে। আর সেই থেকে শুরু হলো তার নতুন জীবন। আচার্যের কাছে সে ছাত্র-জীবনে দীক্ষা নিল।

শিষ্যের মেধা দেখে আচার্য চমৎকৃত হন। তার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বোধিসত্ত্বের মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। এমন ছাত্র লক্ষেও একটি মেলে কিনা সন্দেহ। পিতার মতো স্নেহে তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে ধরেন তার সামনে।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আশ্রম-জীবনে মিত্রবিন্দক যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এ কী পদে পদে নিয়মকানুনের শৃঙ্খল, ছকে-আঁটা একঘেয়ে জীবন! শুধু কি তাই? তার আগে যারা আশ্রমে এসেছে, সেই সব সহপাঠীদের তার সমীহ করে চলতে হয়। সময় সময় তাদের ফাইফরমাশ খাটতে হয়, আদেশও মানতে হয়।

অসহ্য লাগে মিত্রবিন্দকের।

ধীরে ধীরে ছাত্র-জীবনে তার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। লেখাপড়ায় আর মন রইল না। সহপাঠীদের সঙ্গে শুরু হলো তার ঝগড়াবিবাদ, মারামারি।

প্রথম প্রথম সমস্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে সে ছিল একা। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকে কুটিল পথে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, আশ্রমে যে এসেছিল নিষ্করুণ জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে, সে কেন পিছু হটবে ? তাই দেখতে দেখতে ছাত্রদের সে একতা কোথায় উবে গেল! ঈর্ষা দ্বেষ দলাদলিতে আশ্রম-জীবন যেন বিষিয়ে উঠলো।

মেধাবী ছাত্রের স্বভাবের এই ভয়ঙ্কর দিকের পরিচয় পেয়ে অধ্যাপক স্তম্ভিত। দিনের পর দিন মিত্রবিন্দককে তিনি কত উপদেশ দিলেন। বললেন, "বাবা, জীবনে এত আঘাত এত বেদনা পেয়েছ। আজো কি বুঝলে না, অন্যায়ের কি ফল, কুটিল স্বভাবের কি পরিণতি ? এক দিকে শিক্ষাদীক্ষাহীন অন্ধকার জীবনের দুঃখকষ্ট, অন্য দিকে বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের বিপুল প্রতিষ্ঠা—এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা মানুষের কাম্য, একটু ভাল করে ভেবে দেখ, বাবা।"

কিন্তু এসব মিত্রবিন্দকের কানেও ঢুকলো না। শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব তাকে কঠিন শাস্তিও দিলেন। কিন্তু শিষ্য নির্বিকার।

বোধিসত্ত্বের স্নানাহার, চোখের ঘুম ঘুচে গেল। আশ্রমের চিন্তায় তিনি পাগলের মতো। শিক্ষার পরিবেশ নেই সেখানে—সর্বক্ষণ শুধু অশান্তি আর ঝগড়াবিবাদ। আশ্রম বুঝি আর টেকে না। তার নিন্দা ও অখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

মিত্রবিন্দকেরও এটা বুঝতে না পারার কথা নয়। সুতরাং আর কেন ?

জীবনের ওই অধ্যায়ের উপর শেষ যবনিকা টেনে দিয়ে গোপনে সে একদিন আশ্রম ছেড়ে পালালো।

আবার সেই নিরাশ্রয় জীবন। দেশ-দেশান্তরে ঘোরে মিত্রবিন্দক নিরুদ্দেশ পথ—কোথায় সে চলেছে, নিজেই জানে না। অনাহারে অনিদ্রায় আর পথের শ্রান্তিতে প্রথম যৌবনের উত্তেজনা তার ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। দেহ যেন আর বইতে চায় না। তবু দুর্ভাগ্য তাকে স্থির থাকতে দেয় না—ঠেলে নিয়ে চলে কোন্ এক রহস্যময় পরিণতির দিকে।

এমনি করে দিন মাস বছর পিছনে ফেলে শেষে একদিন সে এসে থামলো কাশীরাজ্যের শেষ প্রান্তে—সীমান্তের এক ছোট গ্রামে।

কিন্তু এখানেও সেই একই অবস্থা। মাসের পর মাস কেটে যায়—শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন স্থায়ী কাজ সে জোটাতে পারে না। বেঁচে থাকার তার একমাত্র উপায়—হয় ভিক্ষা, না হয় দিনমজুরি।

সীমান্ত-গাঁয়ের এই মানুষদের সে দেখে। শহর থেকে অনেক অনেক দূরের বাসিন্দা তারা। শিক্ষা-দীক্ষা তাদের খুবই কম—পাকা বুদ্ধিরও একান্ত অভাব। এমন কি গাঁয়ে একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেজন্যে ওদের দুঃখও নেই কিছু। সহজ সরল মানুষগুলি পুত্রকন্যা পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করে।

মিত্রবিন্দক দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার বিপর্যস্ত দেহমন একটু আশ্রয় চায়, একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রামের জন্যে আঁকুপাঁকু করে।

সে আকাশ-পাতাল ভাবে।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা যায়, মিত্রবিন্দকের ভাষা বদলে গেছে, চেহারা পালটে গেছে।

আশ্রমে আচার্যের কাছে থেকে, সামান্য হলেও সে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। তখন কি সে কল্পনাও করেছিল যে, আচার্যের এই যৎসামান্য দান পরবর্তী কালে তার এত বড় উপকারে লাগবে? আজ বাঁচার তাগিদে ঐটাই তার জীবনের একমাত্র পুঁজি হয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একদিন তিলক-চন্দন কেটে সে বড় বড় তত্ত্বকথা আওড়াতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা অবাক হয়। আর মিত্রবিন্দক যেন ততই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফাঁক পেলেই যখন-তখন গ্রামবাসীদের সে শ্লোক শোনায়, সারগর্ভ নীতিবাক্য কয়, যার বেশির ভাগ অর্থ সে নিজেই জানে না। গ্রামবাসীরাও বোঝে না কিছু। আর বোঝে না বলেই তাদের আরো চমক লাগে। ভক্তি-কণ্টকিত চিত্তে হাঁ করে তারা মিত্রবিন্দকের কথা শোনে।

দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে তোলপাড় শুরু হলো। সকলেরই মুখে এক কথা—ছদ্মবেশে তাদের মাঝে কত বড় একজন মহাপণ্ডিতই না এসেছেন! পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত না হলে এমন হয় কখনো?—কেমন নিরহঙ্কার, কেমন নিঃস্বার্থ!

এখন কি করা?

কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে গাঁয়ের সভা বসলো। সবাই এক বাক্যে বললে, "এমন সুযোগ হারানো কোন কাজের কথা নয়।"

সর্বসম্মতিক্রমে মিত্রবিন্দককে তারা গাঁয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করলো। সম্মিলিত চাঁদায় পাঠশালা-ঘর উঠলো। আর সেইসঙ্গে পণ্ডিতের জন্যে উপযুক্ত বাড়ি আর বেতনেরও ব্যবস্থা হলো।

এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হলো মিত্রবিন্দক। এখন থেকে নিরাপদ স্বচ্ছন্দ জীবন।

অল্প দিনের মধ্যেই সে বিয়ে করে সংসার পাতলো। ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে হলো তার। শিশুর কলহাস্যে, শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্যে ছোট সংসারটি ভরে উঠলো। মিত্রবিন্দক বড় সুখী।

কিন্তু গাঁয়ের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আগে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু কোন অশান্তিও ছিল না। মিলে মিশে সুখে শান্তিতে সবাই ঘর সংসার করতো, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীকে বুক

দিয়ে সাহায্য করতো। কিন্তু আজ? মিত্রবিন্দকের আসার কিছুকাল পর থেকে অশান্তি যেন গাঁয়ে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। আর শিক্ষা? সে তো তারা মর্মে মর্মে লাভ করছে। এত সাধের পাঠশালাই কিনা আজ তাদের কাল হলো! যত কিছু শয়তানী মতলব আর সর্বনাশা পরামর্শ, সে-সবেরই জন্ম হয় ঐ পাঠশালা-ঘরে।

কিন্তু মুখ ফুটে কারো কিছু বলারও সাহস নেই। আগে নিয়মিত গাঁয়ের সভা বসতো। সর্বসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সভায় আলোচনা হতো। এক হয়ে সবাই কাজ করতো। কিন্তু এখন পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, দলাদলি ও অবিশ্বাস এমন পর্যায়ে উঠেছে যে, কেউ কারো কাছে মুখ খোলে না; কোন কাজে একমত হওয়া তো দূরের কথা, বহুকাল সভাই বসে না।

দুঃখে ও অশান্তির আগুনে গাঁয়ের মানুষ কাঁদে। উঠতে বসতে মিত্রবিন্দককে তারা অভিসম্পাত দেয় আর মনে মনে গজরায়—কুচক্রী ভণ্ড শয়তান! দিন এলে এর বিচার হবে।

কিন্তু কোন সুরাহা হয় না। প্রকাশ্যে সবাই মিত্রবিন্দককে গাঁয়ের নেতা বলে মানতে বাধ্য হয়।

এমনি করে আট ন' বছর কেটে গেল।

কিন্তু আর চলে না। এই কয় বছরে সর্বনাশ ও মৃত্যু যেন গ্রামখানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

সাত-সাতটা বছর অনাবৃষ্টিতে পুড়ে সব খাক হয়েছে। চাষবাস বন্ধ। কুয়োপুকুর শুকিয়ে ফুটিফাটা। সাত-সাতবার সারা গাঁ সর্বস্বান্ত হলো আগুনে পুড়ে। কত জন মরলো রোগে আর অনাহারে। কত জন গ্রাম ছাড়লো। তার উপর সবার বড় সর্বনাশ—রাজার কোপদৃষ্টি পড়েছে গাঁয়ের উপর। সাত-সাতবার তারা রাজদ্বারে কঠিন শাস্তি পেয়েছে। কি তাদের অপরাধ, কেন এই শাস্তি—আজো তারা তা জানতে পারলো না।

শেষ পর্যন্ত ছন্নছাড়া সর্বস্বান্ত মানুষ আর চুপ করে থাকতে পারে না।

যে প্রশ্ন এত দিন সবার মনে গুমরে ফিরছিল, ক্রমে ক্রমে তা মুখর হয়ে উঠলো। অল্প কালের মধ্যেই তা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো বৈশাখী দাবানলের মতো। দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নির্জীব গ্রামখানা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, গর্জন করে উঠলো, "বিচার চাই—কেন, কেন আমাদের এই নিদারুণ শাস্তি! কার দোষে এত বড় সর্বনাশ হলো আমাদের!"

মিত্রবিন্দক শিউরে উঠলো। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় তার নাওয়া-খাওয়া, চোখের ঘুম প্রায় বন্ধ। কোন ষড়যন্ত্র, ফন্দি-ফিকির আজ আর কাজে এল না। বহুকাল পরে আবার গাঁয়ের সভা বসলো।

আতঙ্কে বুক শুকিয়ে এল মিত্রবিন্দকের।

কয়েক মুহূর্তের সভা। মানুষের এতদিনকার পুঞ্জীভূত বেদনা ও আক্রোশের স্তূপে যেন বিস্ফোরণ ঘটলো। সভা গর্জন করে উঠলো—'দূর করো—এখ্‌খুনি দূর করো ওই কুচক্রী অলক্ষুনে শয়তানকে!'

সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোঁটা, হাতের কাছে যে যা পেল, তাই নিয়ে মানুষ ছুটলো দলে দলে। সপরিবারে মিত্রবিন্দককে তারা মারতে মারতে দূর করে দিল গ্রামের ত্রিসীমানা থেকে।

হতবিহ্বল মিত্রবিন্দক। এ কী হলো! অদৃষ্টের এক নির্মম আঘাতে সব কিছু চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে!

স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে বিমূঢ়ের মতো।

আগে সে ছিল একা। আজ স্ত্রী ও দুইটি অবুঝ কচি সন্তান সঙ্গে। নিষ্পাপ তিনটি জীবনের সে-ই একমাত্র অবলম্বন।

কি সে করবে এখন? কোথায় যাবে? নিঃসম্বল, কপর্দকশূন্য সে—কি দিয়ে বাঁচাবে এদের? কোথায়ই বা মিলবে আশ্রয়?

নিরুপায় ছোট সংসারটির হাত ধরে অজানা ভবিষ্যতের দিকে সে পা বাড়ালো।

চলেছে তো চলেইছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রায়ই খাওয়া জোটে না। যেদিন জোটে, সেদিনও আধপেটা! কচি সন্তান দুটির মুখে নিজেদের মুখের গ্রাস তুলে দেয়।

মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় অধিকাংশ দিন তাদের রাত কাটে। আশ্রয় মেলে না কোথাও।

ধীরে ধীরে বসতি ক্রমেই কমে আসে।

কিছুদূর যেতেই লোকালয় শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। ভয়ঙ্কর—দেখলে বুক কাঁপে। জল নেই, গাছপালা নেই, পাথরের মতো শুকনো মাটি।

মাথার উপরে অগ্নিবর্ষী সূর্য। পায়ের তলায় আগুনের মতো উত্তপ্ত পৃথিবী। শিশু দুটিকে কোলে পিঠে করে স্বামী-স্ত্রী অগ্রসর হয় রোদ-ঝলসানো দিগন্তের দিকে। এক ফোঁটা জলের জন্যে অন্তরাত্মা আকুলি বিকুলি করে। ছেলে দুটি এতক্ষণ ছটফট করে এখন ধুঁকছে। কান্নার শক্তিও নেই।

সারা পৃথিবী যেন আগুনের গোলা।

আকুল চোখে তারা তাকায় দিগন্তের পানেঃ আর কত দূর? কোথায় লোকালয়?

অনেকক্ষণ পরে ভয়ঙ্কর প্রান্তর শেষ হলো এক সময়। দেখা দিল ছোটখাট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। আর এক জলাশয়।

আঃ!

সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

স্ত্রীর আর চলার শক্তি নেই। ক্ষতবিক্ষত পা দুটো ফুলে গেছে। পথের কষ্ট আর অনাহারের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে নিষ্করুণ চিহ্ন রেখে গেছে।

মিত্রবিন্দক ব্যস্ত হয়ে উঠলো। থামলে তো চলবে না। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বেলা থাকতেই জঙ্গল পার হতে হবে। জঙ্গলের পরেই মিলবে লোকালয়।

মিলবে ? লোকালয় মিলবে ? আবার মিলবে মানুষের সংসার ? স্ত্রী অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো।

আর মিত্রবিন্দক ছেলে দুটিকে কাঁধে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে ঝোপঝাড় কাঁটাবন ভেঙে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু এ কী! জঙ্গল যে ক্রমেই ঘন হয়ে আসে! বড় বড় গাছপালা শুরু হয়েছে। অতি বৃদ্ধ সব বনস্পতি যেন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

## মিত্রবিন্দক

বিহ্বল চোখে মিত্রবিন্দক এদিক-ওদিক তাকায়। কোন্ দিকে চলেছে তারা ?

যত তারা এগোয়, বন ততই গভীর হয়। কোথায় পথ ? মিত্রবিন্দকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। হা ভগবান! এ কী হলো ?

অরণ্যের মাথায় অপরাহ্নের আলো তখন পাতায় পাতায় শেষ আলাপ সেরে বিদায় নিচ্ছে। নীচে নামছে থমথমে অন্ধকার। শব্দহীন নিষ্কম্প অরণ্য যেন কি এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে!

পথহারা চারটি প্রাণীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। কারো মুখে কথা নেই। চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। ছেলে দুটিও চুপ করে গেছে।

দেখতে দেখতে বনের বুকে নেমে এল অমানিশার অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ে না। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে তারা বসে পড়লো। চারিদিক নিথর নিঝুম। জোরে নিশ্বাস ফেলতেও যেন ভয় হয়।

এমন সময় ও কী! তারা চমকে উঠলো ঃ ও কিসের গর্জন ? বহুদূর কোন্ অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে প্রলয় গর্জনের মতো ?

গর্জন তড়িৎ বেগে ছুটে আসতে লাগলো, স্পষ্ট হতে লাগলো ক্রমেই।

ক্ষণেকের জন্যে মিত্রবিন্দক যেন পাথর হয়ে গেল। পরক্ষণে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো পাগলের মতো। অরণ্যও বুঝি হাহাকার করে উঠলো ঃ

“রাক্ষস! রাক্ষস! রাক্ষসের বনে আমরা ঢুকেছি। পালাও, পালাও! আর রক্ষে নেই!”

কিন্তু কোথায় পালাবে ? অন্ধকারে কে কোথায় ছিটকে পড়লো! অল্পের জন্যে মিত্রবিন্দক রক্ষা পেল বটে, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তান দুটি হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

তারপর কত দিন কেটে গেছে!

এক পাগল ঘুরছে পথে পথে। স্মৃতিভ্রষ্ট বদ্ধ উন্মাদ সে। মাথাভরা লম্বা রুক্ষ চুলে জট পাকিয়ে গেছে। মুখভরা দাড়িগোঁফ। পরনে শতছিন্ন ময়লা কাপড়।

পাগল নিজের মনে বিড় বিড় করছে। কখনো হাসছে। কখনো কি এক অসহ্য ব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদছে। কখনো আবার হাহাকার করে ছুটছে কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর দিকে।

গ্রাম-জনপদ পার হয়ে, পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে পাগল কোথায় চলেছে! কত কাল কেটে যায়, তার খেয়াল নেই।

এমনি করে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সে চমকে উঠলো। কোথা থেকে ভেসে আসছে এক মহা গর্জন! সে চীৎকার করে উঠলো, "রাক্ষস! রাক্ষস!"

হিংস্র আক্রোশে সে ছুটলো, গর্জন আসছে যেদিক থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এল তার স্মৃতিশক্তি, তার অতীত ও বর্তমান।

মিত্রবিন্দক থমকে দাঁড়ালো : সমুদ্র! সামনে তার সীমাহীন নীল জলরাশি। ফেনিল তরঙ্গমালা উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে এদিক-ওদিক তাকায়। দূরে দেখা যায় কোন্ এক পত্তন বা বন্দর।

এ সে কোথায় এল? কি করে এল? কোথায় আর সবাই?

নিষ্পলক চোখে সে দাঁড়িয়ে থাকে। শূন্য দৃষ্টি তার দিগন্তে প্রসারিত, আকাশ যেখানে সাগরকে আলিঙ্গন করছে।

কোথায়? কোথায় তারা? স্ত্রী ··· ছেলে দুটি?

জনহীন রুক্ষ বন্ধুর উপকূল। জলকণার ঝাপটা এসে লাগছে তার চোখে মুখে। পাগলা হাওয়ায় রুক্ষ চুলদাড়ি উড়ছে। স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করে পাগলের মতো কি খুঁজছে মিত্রবিন্দক?···

ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করে তার মনের দিগন্তে ছবি ভেসে ওঠে। টুকরো টুকরো ছবি—সীমান্ত-গ্রাম···সংসার···স্ত্রী দুই ছেলে··· মহারণ্য···ভয়ঙ্কর রাত্রি···তারপর···তারপর···

মিত্রবিন্দকের মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। চেতনা হারিয়ে সে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে।

ধীরে ধীরে সূর্য বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। নেমে এল ধূসর ম্লান গোধূলি। দূরে বন্দরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো—শত শত জোনাকির মতো।

আর নির্জন উপকূলে পড়ে রইল নিঃসঙ্গ মিত্রবিন্দক—সংজ্ঞাহীন।

তারপর এক সময় চেতনা ফিরতে সে উঠে বসলো। অস্থির পদে উঠে দাঁড়ালো। চারিদিকে একবার তাকিয়ে চললো বন্দরের দিকে।

বন্দরের নাম গম্ভীরা।

বন্দরের পথ দিয়ে মিত্রবিন্দক চলেছে। পথে পথে ঘুরছে। হঠাৎ এক সময় তার কানে এল, কে যেন ঘোষণা করছে, "অলকানন্দা নামে এক জলযান আগামীকাল ভোরে সমুদ্র-যাত্রা করবে। অলকানন্দায় কাজের জন্যে একজন লোকের প্রয়োজন। কে যেতে চাও? এসো, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।"

মিত্রবিন্দক নীরবে-শুনলো সে ঘোষণা…এক বার…ছু বার… তিন বার।

তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল ঘোষকের কাছে।

সমুদ্রজীবন—মিত্রবিন্দকের নতুন অভিজ্ঞতা। নীচে আদি-অন্তহীন জল আর জল—শান্ত নীল সমুদ্র। আর উপরে অনন্ত নীল আকাশ। রৌদ্রস্নাত হাসিমাখা দিনের পরে আসে তারায় ভরা মনোরম রাত্রি। দুঃখ নেই, জ্বালা নেই কোথাও—সব কিছু যেন আনন্দময়। মিত্রবিন্দকের দগ্ধ মনের উপর ধীরে ধীরে শান্তির প্রলেপ পড়ে।

জাহাজ চলেছে। মুক্তপক্ষ শুভ্র মরালের মতো পাল তুলে অলকানন্দা চলেছে দূর লক্ষ্যের দিকে। স্বচ্ছন্দগতি। নাবিকদের দাঁড় নামছে, উঠছে গানের তালে তালে। সবাই উৎফুল্ল।

এক দিন, দু দিন করে সাত দিন কাটতে চললো। বাধা নেই, বিপত্তি নেই কোথাও।

এমন সময় হঠাৎ সবাই চমকে উঠলো। জাহাজ নিশ্চল হয়ে গেছে! সর্বনাশ! সমুদ্রমগ্ন কোনো পর্বত-চূড়ায় জাহাজ আটকে গেল না তো! সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু নাঃ! তাও তো নয়! তাহলে?

তন্ন তন্ন করে সব কিছু পরীক্ষা করা হলো। কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

এখন উপায় ?—সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড ! এমন অঘটন তো কেউ কখনো শোনে নি !

হঠাৎ একজনের মনে পড়লো, জাহাজে একজন ভাল গণৎকার আছেন। সবাই গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলো। গণৎকার বললেন, "অলকানন্দায় মনে হয় অলক্ষুনে এমন কেউ আছে, যার জন্যে এই বিপত্তি ঘটেছে।"

তিনি গণনায় বসলেন। ঘুঁটি ফেলা হলো। দেখা গেল, নাম উঠেছে সেই স্বল্পভাষী নবাগত লোকটির, যে নীরবে কাজ করে যায়, আর মাঝে মাঝে বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে দূর দিগন্তের দিকে।

মিত্রবিন্দকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার নাম উঠেছে। বজ্রাহতের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল।

গণৎকার আবার দান ফেললেন। এবারও নাম ওঠে মিত্র-বিন্দকের। অসহায় ব্যাকুল চোখে সে আশেপাশে তাকালো। নির্মম কঠিন সব মুখ !—মমতার শেষ বিন্দুটুকু কে যেন মুছে নিয়েছে।

গণৎকার সাত-সাতবার দান ফেললেন। প্রতিবার সেই একই নাম উঠলো।

সুতরাং সন্দেহের আর অবকাশ কোথায় ?

তৎক্ষণাৎ সবাই লেগে গেল ভেলা তৈরি করতে। মিত্রবিন্দক জনে জনে সকলের হাতে পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু কে কান দেবে তার কথায় ! কাজ শেষ হতেই কিছু পানীয় জল আর খাবার দিয়ে সবাই ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে দিল ভেলার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও দুলে উঠলো। সকলের সোল্লাস জয়ধ্বনির মাঝে অলকানন্দা কিছুক্ষণের মধ্যে দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেল।

কূলকিনারাহীন অথই সমুদ্রে সামান্য ভেলা ভাসছে। ভেলার উপরে বিমূঢ় মিত্রবিন্দক। কোনো জাহাজ নজরে পড়ে না। ডাঙারও চিহ্ন নেই কোথাও।

ভেলা ভেসে চলে।

দিন যায়, রাত্রি আসে। দিনের বেলায় সূর্য অগ্নি বর্ষণ করে, আর রাতে নির্মেঘ আকাশে তারার মেলা বসে।

সময় সময় ভেলার আশে পাশে হাঙর-কুমীর ঘোরে। আতঙ্কে মিত্রবিন্দক দাঁড় টানে আর প্রাণপণে যুঝতে থাকে তাদের সঙ্গে। তাদের লেজের ঝাপটায় ভেলা এক-একবার উলটে যায় আর কি!

কয়েক দিনের মধ্যেই খাবার ফুরিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল পিপাসার জল। তৃষ্ণায় মিত্রবিন্দক ছটফট করে। চারিদিকে এত জল। অথচ তার এক ফোঁটা সে মুখে তুলতে পারে না—এমনি লোনা।

দাঁড় টানার শক্তি তার ফুরিয়ে আসে। সে বসে থাকে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো। আর বুঝি স্বপ্ন দেখে। শৈশব-কৈশোর···আচার্যের আশ্রম··· সীমান্ত-গ্রাম, সব ফিরে আসে। দেখে, স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে, ছেলে দুটি খেলা করছে···

পরক্ষণে 'রাক্ষস! রাক্ষস!' বলে সে চীৎকার করে জেগে ওঠে। অবসন্নের মতো তাকায় চারিদিকে।

জীবনে এই প্রথম মিত্রবিন্দক আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে।

একদিন এমনিভাবে জেগে উঠে দিগন্তের দিকে তাকাতেই সে সজাগ হয়ে উঠলো। দূরে বহুদূরে জাহাজের মতো কি যেন একটা দেখা যায়!

স্বপ্ন নয় তো! মিত্রবিন্দক চোখ রগড়ে, নড়ে চড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকালো। না, স্বপ্ন নয়! সত্যিই জাহাজ একখানা।

দেহে যেন তার নতুন বল ফিরে আসে। সে দাঁড় টানে প্রাণপণে।

ভেলা যত এগোয়, ততই সে অবাক হয়। জাহাজের কাছে গিয়ে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক জাহাজ নয়, জাহাজের মতো অপূর্ব রথ একখানা, আগাগোড়া স্ফটিকের তৈরী—জলের উপর সেটা স্থির হয়ে আছে। রথ যে এত সুন্দর হতে পারে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।

ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে মিত্রবিন্দক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল।

তারপর এক সময় চমক ভাঙতে সন্তর্পণে সে রথের কাছে গিয়ে ভেলাটাকে লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে রথের উপর উঠে পড়লো।

ভয়ে তার বুক দুরু দুরু করে। আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সে এগোয় আর অবাক হয়। জগতের কোথাও যে বিলাস-ব্যসনের এত আয়োজন থাকতে পারে, তা কল্পনাতীত। এ সে কোথায় এল ?

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই সে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো ঃ অদূরে চারজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। তারা অপরূপ সুন্দরী। এত সুন্দরী যে চোখ ফিরানো যায় না।

বিমূঢ়ের মতো মিত্রবিন্দক দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে তার সারা দেহ কণ্টকিত।

তরুণীরা মৃদু হেসে মধুর কণ্ঠে বললে, "ভাই অতিথি, তুমি কি ভয় পেয়েছো ? কোনো ভয় নেই। আমরা দেবকন্যা। অন্যায় করেছিলাম, তাই দেবরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। থাকবে তুমি আমাদের সঙ্গে ? তোমাকে দেখে আমরা বড় খুশী হয়েছি। থাকো ভাই এখানে।"

আনন্দে মিত্রবিন্দকের ইচ্ছা হলো ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। দেবকন্যারা তাকে ওদের সঙ্গে এমন জায়গায় থাকতে অনুরোধ করবে,—এ সৌভাগ্য সে কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছে ?

সুতরাং সে রয়ে গেল সেখানে। কথাবার্তায় সে আরো পরিচয় পেল দেবকন্যাদের। দেবরাজ্যের আনন্দসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েও ওরা

নিস্তার পায় নি। এখানকার এই স্বল্প সুখও তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে পারে না। এক সপ্তাহ তারা সুখ ভোগ করে, পরের সপ্তাহ দুঃখে কাটায়। আর সে-সময় তারা এখানে থাকতে পারে না, অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে তারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

রথের উপরে মিত্রবিন্দকের দিন কাটে যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। আনন্দবিলাসের সীমা নেই—না চাইতেই সব যেন তার হাতের কাছে এসে জড়ো হয়।

এমনি করে সাত দিন কেটে গেল। কোথা দিয়ে যে কাটলো, মিত্রবিন্দক টেরই পায় নি। তার চমক ভাঙলো, যখন এক সন্ধ্যায় ছল-ছল চোখে দেবকন্যারা এসে বললে, "ভাই, কাল থেকে আমাদের দুঃখের সপ্তাহ শুরু হবে। সাত দিনের জন্য অন্যত্র যেতে হবে আমাদের।"

পরদিন ভোরে বিদায় নেবার সময় মিত্রবিন্দককে তারা বারবার সাবধান করে দিয়ে বললে, "ভাই, রথ ছেড়ে কোথাও যেও না কিন্তু। তাহলে বিপদ ঘটবে। একটু অসুবিধা ঘটলেও আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থেকো। বুঝলে ?"

মিত্রবিন্দক হাঁ-না কিছুই বললে না। দেবকন্যারা চলে যেতেই সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেঃ ছোঃ! বয়ে গেছে তার এখানে থাকতে !

এই কয় দিনে দেবকন্যাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে পরিষ্কার বুঝেছে, সামনে কোথাও এর চেয়েও ভাল জায়গা আছে।

মুহূর্ত দেরি না করে গোপন স্থান থেকে সে ভেলা টেনে বের করলো।

আবার সেই অকূল সমুদ্র। দেখতে দেখতে স্ফটিকের রথ কোথায় মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে দূরে দিগন্তরেখায় দেখা গেল, আর

একখানা রথ ঝলমল করছে। রথের কাছে গিয়ে মিত্রবিন্দকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রূপোর তৈরী এ দেবযান—স্ফটিক-রথের চেয়ে শতগুণ সুন্দর।

*আগের মতোই ভেলা লুকিয়ে রেখে মিত্রবিন্দক রথে উঠলো।*

এখানে বাস করে আটজন দেবকন্যা। এদেরও অবস্থা আগেকার দেবকন্যাদের মতো। মিত্রবিন্দককে পেয়ে তারাও খুব সুখী হলো।

দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। বিদায় নেবার সময় স্ফটিক-রথের কন্যাদের মতো তারাও বারবার সাবধান করে গেল মিত্রবিন্দককে, কোথাও যেন সে না যায়।

কিন্তু কে শুনবে সে কথা! মিত্রবিন্দকের ভেলা আবার সমুদ্রে ভাসলো। তাদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝেছিল, সামনে কোথাও এর চেয়েও আরামের জায়গা আছে।

বহুক্ষণ পরে তার দৃষ্টির সামনে দিগন্তরেখায় আবার একখানা রথ জেগে উঠলো। তার গা থেকে আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। সে রথ মণিময়।

এখানে বাস করে ষোলজন দেবকন্যা। এদেরও জীবন আগের কন্যাদের মতো। এরাও মিত্রবিন্দককে সাদরে গ্রহণ করলো।

তারপর সেই একই ঘটনা। এখানকার দেবকন্যারাও অন্যত্র যাবার আগে মিত্রবিন্দককে কোথাও না যেতে বারবার নিষেধ করে গেল।

কিন্তু ফল কি হলো, বুঝতেই পারছো! মিত্রবিন্দক আবার ভেলা ভাসালো সমুদ্রে। কারণ এর চেয়েও ভাল স্থান যে সামনে আছে, তা সে আগেই জেনেছিল।

কতক্ষণ পরে—হঠাৎ একসময় বহুদূর দিগন্তে চোখ পড়তেই সে চমকে উঠলো। সমুদ্রের এক কোণে আগুন লেগেছে, মনে হয়। দিগন্ত আলোয় আলোময়।

কাছে গিয়ে সে যা দেখলো, তা মানুষের কল্পনারও বাইরে ঃ এক অদ্ভুত দেবযান, ত্রিভুবনে যার শোভার তুলনা নেই। স্বর্ণময় সে-রথ মণিমাণিক্যে ঝলমল করছে।

*এখানে বাস করে চব্বিশজন দেবকন্যা। আগের কন্যাদের মতো* এদেরও অভিশপ্ত জীবন।

দেবভোগ্য অফুরন্ত আনন্দ-সুখ এখানে। সব কিছু যেন স্বর্গের সুষমা দিয়ে তৈরী। সাতটা দিন মিত্রবিন্দকের যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে গেল। এবার বিদায়ের পালা। দেবকন্যারা জনে জনে মিত্র-বিন্দককে বারবার সাবধান করে বললে, "ভাই, খুব সাবধানে থেকো। রথ ছেড়ে কোথাও যেও না। তাহলে কিন্তু নিশ্চিত বিপদ ঘটবে।"

মিত্রবিন্দক মনে মনে হাসলো ঃ 'হুঁ, সবারই ওই এক কথা। আরে বাপু, তোমাদের কথা শুনলে এত সুখ আমি কোথায় পেতাম ? ওসব ভয় দেখানো কথা অনেক শুনেছি।'

সুতরাং আবার সে রওনা হয়। এবার সে চলেছে হীরক-রথের উদ্দেশে। সেখানকার সুখের কল্পনায় সে বিভোর।

কিন্তু যত দেরি হয়, ততই সে সচকিত হয়ে ওঠে। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয় ঃ তাই তো! কি হলো ? সেই কোন্ ভোরে রওনা হয়েছে, সূর্য এখন প্রায় মাথার উপরে। এত দেরি হবার তো কথা নয়। সেই সকাল থেকে এক ফোঁটা জল বা দানা পেটে পড়ে নি। সঙ্গেও আনে নি কিছু। ফিরে যাবে, তারও উপায় নেই। স্বর্ণরথ কোথায় হারিয়ে গেছে!

স্রোতের টানে পাক খেতে খেতে ভেলা ভেসে চলে। ভেলার উপরে মিত্রবিন্দক ক্ষুধা তৃষ্ণা আর উৎকণ্ঠায় কাতর।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ এক সময় সে দেখে, দূরে—বহুদূরে কি যেন দেখা যায়!···না, রথ নয়—এক স্থলভাগ। তার কালো উপকূল-রেখা মেঘের মতো দিগন্তে মিশে আছে।

স্থলভাগ ক্রমেই স্পষ্ট হয়।...

এক অজানা দেশ—বহু দ্বীপের সমষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার জনমানবের সাড়া নেই কোথাও। একটা প্রাণীও চোখে পড়ে না।

ভেলা তখন দ্বীপগুলির ভিতর দিয়ে চলেছে। একটা বড় দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিত্রবিন্দক হঠাৎ বহুদূরে এক সুন্দর প্রাসাদ দেখতে পায়।

কোন রাজপুরী হয়তো! তাড়াতাড়ি এক ঝোপের আড়ালে ভেলা বেঁধে সে নেমে পড়লো। দ্রুত পা চালিয়ে দিল রাজপুরীর দিকে। কিন্তু একবারও ভাবলে না যে, অমন সুন্দর বিশাল রাজপ্রাসাদ যে দেশে, সেখানে মানুষ নেই কেন? দূর থেকে হলেও প্রাসাদ কেন ওরকম নির্জন পরিত্যক্ত মনে হয়?

মিত্রবিন্দক দ্রুত এগিয়ে চললো নরখাদক যক্ষদের পুরীর দিকে।

কিছুদূর যেতেই সে দেখে, অদূরে একটা ছাগল চরছে।

ক্ষিদেয় তখন পেট জ্বলছে। হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি ছাগলটাকে দেখে তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রাজপুরী তখনো অনেক দূর। সুতরাং ছাগলটাকে দিয়েই আগে ক্ষিদেশান্তি করা যাক।

পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল। ছাগলটা পিছন ফিরে চরছিল। মিত্রবিন্দক অতি সন্তর্পণে গিয়ে হঠাৎ খপ্ করে তার পিছনের একখানা পা চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে অমনি আর কি!—

ছাগলটা আসলে ছাগলই নয়—এক যক্ষিণী ছাগলের মূর্তি ধরে চরছিল সেখানে। মিত্রবিন্দক হঠাৎ পা চেপে ধরতেই সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ফিরে তাকানোর কথা ভাববারও সময় পেল না। নিদারুণ ভয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সে মারলো এক লাথি।

কথায় বলে, যক্ষিণীর লাথি! সে কি আর যা-তা ব্যাপার! লাথির চোটে মিত্রবিন্দক ছিটকে আকাশে উঠে গেল। তারপর

ঘুরপাক খেতে খেতে চললো আকাশপথে—কখনো উপুড় হয়ে, কখনো কাত হয়ে, কখনো বা চিত হয়ে। মাথা তার কখনো নীচের দিকে নামে, কখনো বা ওঠে উপরে। কখনো সে সংজ্ঞাহীন, কখনো বা ক্ষণেকের জন্যে সংজ্ঞা ফিরে আসে। দুঃসহ যন্ত্রণায় সারা দেহ তার কাঁপে থরথর করে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করে মিত্রবিন্দক।

এমনিভাবে কত দণ্ড, কত প্রহর, কত সময় কেটে যায়! কত দেশ-দেশান্তর, সাগর-মহাসাগর, অরণ্য-পর্বতের উপর দিয়ে ছুটে চলে মিত্রবিন্দক।

শেষে এক সময় সে এসে ধপাস করে পড়ে মাটিতে। তার ভাগ্য ভাল বলতে হবে—যেখানে এসে পড়লো, সেখানটা বড় বড় ঘাস, লতাপাতা আর কাঁটা ঝোপঝাড়ে ভরা ছিল। তাই কাঁটায় তার গা হাত পা ছড়ে গেল বটে, কিন্তু প্রাণটা রক্ষা পেল।

ধীরে ধীরে মিত্রবিন্দক চোখ মেললো। বড় দুর্বল, বড় ক্লান্ত সে। সর্বশরীর ব্যথায় টনটন করছে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থেকে যেমন সে উঠতে যাবে, অমনি আবার সে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো নীচের দিকে। এবার পাতালে চললো বোধহয়?

কিন্তু না—কয়েক মুহূর্ত পরে ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো।

অপরিচিত এক দেশ।

হঠাৎ পিছনে একটা খসখস শব্দ কানে যেতেই সে ফিরে দাঁড়ালো। দেখে, অল্প দূরে এক পাল ছাগল চরছে।

ছাগল!—মিত্রবিন্দক চমকে উঠলো। চকিতে তার মনে পড়লো সেই দ্বীপের কথা। একটা ছাগলের লাথির ঘায়ে সে এখানে এসেছে, এদের একটার পা ধরলে হয়তো আবার সেই দেবকন্যাদের কাছে গিয়ে পড়বে।

ছুটে গিয়ে সে বড় একটা ছাগলের পা জড়িয়ে ধরলো। ছাগলটা ভয় পেয়ে ভ্যা করে উঠতেই কোথায় ছিল একদল লোক, ছুটে এসে জাপটে ধরলো তাকে।

ছাগলগুলো ছিল কাশীরাজের। মিত্রবিন্দক যেখানে এসে পড়েছিল, সেটা ছিল বারাণসী নগরীর উপকণ্ঠ—নগর-প্রাকারের গড়-খাই। কিছুকাল যাবৎ রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছিল বলে পাহারাদাররা চোর ধরার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। মিত্রবিন্দক তাদের হাতে ধরা পড়লো।

মারতে মারতে পাহারাদাররা বললে, "ব্যাটা, এতকাল তাহলে রাজার ছাগল তুই-ই চুরি করছিলি?"

মিত্রবিন্দক প্রথম দিকে কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিল, পাহারাদারদের কথা শুনে চমকে উঠলো; বললে, "কি বলছো তোমরা? আমি এদেশে ছিলাম না, এদেশের লোক আমি নই। রাজার ছাগলও আমি চুরি করতে আসি নি।"

হি-হি করে হেসে উঠলো পাহারাদাররা। তার গালে প্রকাণ্ড এক চড় কষিয়ে দিয়ে একজন গর্জন করে উঠলো, "তবে কি করতে এসেছিলি রে, শয়তান? ছাগলের পা ধরেছিলি কি ওকে পুজো করার জন্যে?"

মিত্রবিন্দককে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে তারা নিয়ে চললো রাজার কাছে।

শাস্তির কথা ভেবে মিত্রবিন্দক হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। ছাগল চুরির অপরাধে আজ তাকে শূলে যেতে হবে। কে বিশ্বাস করবে তার কথা?

কাঁদতে কাঁদতে ক্ষীণকণ্ঠে সে যত বলে, "আমি চোর নই, আমায় ছেড়ে দাও···", পাহারাওয়ালারা ততই মারে আর বলে, "তবে তুই কি রে, ব্যাটা? রাজবাড়ির গুরুদেব?"

রাজপথে কত লোক যাতায়াত করে। পাহারাওয়ালাদের কথা শুনে সবাই হাসে, টিটকারি দিতে দিতে চলে যায়।

মিত্রবিন্দক যেন আর দাঁড়াতে পারে না। তার পা টলছে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, চোখ-মুখ ফুলে গেছে। মারের চোটে এক-একবার সে চোখে আঁধার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। পাহারাওয়ালারা অমনি টেনে তোলে ; বলে, "বদমাশ, চালাকি পেয়েছিস ? ভেবেছিস, এই সব ন্যাকামিতে আমরা ভুলবো ?"

এমন সময় পাঁচ শো শিষ্য সঙ্গে আচার্য বোধিসত্ত্ব সেই পথ দিয়ে নদীতে যাচ্ছিলেন স্নান করতে। মিত্রবিন্দককে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। মিত্রবিন্দকেরও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ঃ আর রক্ষা নেই ! রাজার কাছে এবার তার অতীত দুষ্কর্মও ফাঁস হবে।

মিত্রবিন্দকের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বোধিসত্ত্ব পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করলেন, "একে মারছো কেন, বাপু ? নিয়েই বা চলেছো কোথায় ?"

সসম্ভ্রমে পাহারাওয়ালারা বললে, "প্রভু, এ ব্যাটা চোর। কিছুদিন ধরে রাজার ছাগল চুরি যাচ্ছিল বলে আমরা লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম। এ ব্যাটা হঠাৎ কোথা থেকে চুপিসাড়ে এসে বড় ছাগলটার পা ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়। তাই ওকে মহারাজের কাছে নিয়ে চলেছি।"

মিত্রবিন্দকের দিকে তাকিয়ে আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে বাপু, ওরা যা বলছে, তা কি সত্যি ? মিথ্যে বলো না।"

কাঁপতে কাঁপতে মিত্রবিন্দক আচার্যের পদতলে বসে পড়লো, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "না গুরুদেব, আমি চোর নই। জীবনভোর অনেক অন্যায় করেছি সত্যি, কিন্তু কখনো চুরি করি নি, মিথ্যেও বলি নি। গুরুদেব, বিশ্বাস করুন—এদেশে আমি ছিলাম না, কিছুক্ষণ আগে এসেছি। চুরি করার জন্যে ছাগলের পা ধরি নি, ধরেছিলাম অন্য কারণে। ওরা কেউ তা শুনলে না। শুনলেও তা বিশ্বাস করতো না। আপনি বিশ্বাস করুন, গুরুদেব।"

তার কথা শুনে পাহারাওয়ালারা 'বটে রে!' বলে ডাণ্ডা উঠোতেই বোধিসত্ত্ব বাধা দিলেন। বললেন, "শোন বাপু, তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে···"

পাহারাওয়ালারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, "এ কি বলছেন, গুরুদেব? আপনি আমাদের অনুরোধ করবেন কি? আদেশ করুন।"

মৃদু হেসে বোধিসত্ত্ব বললেন, "বেশ, বেশ, তাই হলো। তা দেখ, এ লোকটা এককালে আমার শিষ্য ছিল। ওকে তোমরা আমার হাতে দিয়ে যাও। আমিই ওকে শাসন করবো। চিরকাল ও আমার দাস হয়ে থাকবে।"

পাহারাওয়ালারা আর দ্বিরুক্তি করলো না। মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হাতে দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল।

আশ্রমে এসে সেই যে মিত্রবিন্দক এককোণে আশ্রয় নিয়েছিল, আর উঠলো না—স্নান করলো না, খেল না। কত জনে কত অনুরোধ করলো, সাধ্যসাধনা করলো। কিন্তু মিত্রবিন্দক যেন নিশ্চল পাষাণ। দৃষ্টি তার বহু দূর পিছনে চলে গেছে :

সেই আশ্রম! কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যেখানে সে আশ্রয় পেয়েছিল, স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিল, পেয়েছিল নতুন জীবনের আস্বাদ—অতীতের কত স্মৃতিঘেরা সেই আশ্রম! সেই গুরুদেব!

ধীরে ধীরে দিন শেষ হলো, সূর্য ডুবলো পশ্চিমে। আপন আপন নীড়ে ফিরলো সবাই।

সন্ধ্যার পরে বোধিসত্ত্ব এলেন। তার মাথায় হাত রেখে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, "মিত্রবিন্দক, বাবা, সারাটা দিন একভাবে বসে রইলে?"

মিত্রবিন্দক একবার নড়ে উঠলো। মমতাভরা চোখে বোধিসত্ত্ব বললেন, "বাবা, এ কয় বছরে তোমার জীবনে কি ঘটেছে, জানি না। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, অনেক দুঃখবেদনা তুমি পেয়েছো। সে সব কথা এখন থাক, বাবা। যা চলে গেছে, শত কাঁদলেও তা আর ফিরে আসবে না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ কিছু ঠিক করেছো কি, কি করবে এখন?···কথা বলো, মিত্রবিন্দক। আমি তো শুধু তোমার গুরু নই, তোমার পিতৃসমও বটে।"

আকুল হয়ে এবার কেঁদে উঠলো মিত্রবিন্দক, আচার্যের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বললে, "গুরুদেব, আমি···আমি···আমায় একটু আশ্রয় দিন গুরুদেব, বাকী জীবন আপনার দাস···"

সজল চোখে গুরুদেব তার মাথায় হাত রাখলেন।

# চিরস্মরণীয়া গোস্তমণি

গঙ্গার তীরে নির্জন গহন বন। বনের পাশে গাছপালার অন্তরালে লতায় পাতায় ছাওয়া এক ঋষির কুটির।

লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন এই বনরাজ্যে ঋষি বাস করেন। গঙ্গার তীরে তপস্যা করেন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত, কোন কিছুতেই তাঁর গ্রাহ্য নেই—এমনি সে কঠোর তপস্যা। আপনভোলা ঋষি ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর।

কিন্তু সন্ধ্যার পরে কুটিরে ফিরে মাঝে মাঝে তাঁর বড় কষ্ট হয়। সারা দিন জপতপ ধ্যানধারণায় কেটে যায়, কিন্তু সন্ধ্যার পরে তাঁর সময় যেন আর কাটতে চায় না। অন্ধকার নিস্তব্ধ অরণ্যের মাঝে নিজেকে বড় একলা নিঃসঙ্গ মনে হয়।

ঋষির কুটিরে বাস করে এক ইঁদুর। ঋষি তাকে বড় ভালবাসেন। ইঁদুরও তাঁকে দেখে আপন জনের মতো—তাঁর পোষা যেন। ঋষি কুটিরে ফিরলে আনন্দে নাচতে নাচতে সে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, তাঁর হাতে পায়ে কোলে পিঠে চড়ে তাঁকে অস্থির করে তোলে। ঋষি খুশী হন। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটে না। বারে বারে কেবলই মনে হয়—আহা! গল্পগুজব করবার, দুটো ধর্মকথা কইবার একজন সঙ্গী যদি থাকতো!

ঋষি ভাবেন। কিন্তু যত দিন যায়, নিঃসঙ্গতা যেন ততই বাড়তে থাকে। দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝে তপস্যাতেও তাঁর বাধা পড়ে।

শেষে কোন উপায় না দেখে ঋষি একদিন ইঁদুরটিকেই মানুষের মতো কথা বলার শক্তি দিলেন। তার নাম রাখলেন 'কুট্টুর'।

এর পর থেকে ঋষির আর কোন কষ্ট রইল না। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে কুট্টুর তাঁকে মানুষের ভাষায় কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়, গল্পগুজবে ধর্মকথা-আলোচনায় ঋষির সময় চমৎকার কেটে যায়।

কিছুকাল পরে……

একদিন সন্ধ্যায় ঋষি কুটিরে ফিরতে ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। বিমর্ষ কণ্ঠে ঋষিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চুপ করে বসে রইল একপাশে।

অবাক হয়ে ঋষি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, কুট্টুর? মন খারাপ কেন?"

ছলছল চোখে কুট্টুর বললে, "প্রভু, অনেক দিন যাবৎ বলি-বলি করেও কথাটা আপনাকে বলতে পারি নি, আজ আর না বলে পারছি নে। আমি বড় বিপদের মধ্যে আছি।"

"বিপদ! কিসের বিপদ?"

ইঁদুর বললে, "প্রভু, সকালবেলায় আপনি বেরিয়ে গেলে কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে রোজ ঘরে ঢোকে। আমাকে ধরার জন্যে

নানাভাবে চেষ্টা করে। আর ভয়ে আধমরা হয়ে আমি গর্তের মধ্যে পড়ে থাকি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—এভাবে চললে তার হাতেই একদিন-না-একদিন আমার প্রাণ যাবে।"

বিচলিত কণ্ঠে ঋষি বললেন, "কী সাংঘাতিক কথা! কি করা যায় বলো তো?"

ইঁদুর বললে, "প্রভু, যদি অসন্তুষ্ট না হন তো, আমার একটা প্রার্থনা পূরণ করে দিন। আমাকে দয়া করে বিড়াল করে দিন—যাতে আর কোন বিড়াল আমার কাছেও ঘেঁষতে না পারে।"

ঋষি তখনি এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল নিয়ে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "তথাস্তু!"

চোখের পলকে ইঁদুর বিড়ালে রূপান্তরিত হলো।

কিছুদিন পরে আবার এক সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরে ঋষি দেখেন, গম্ভীর মুখে বিড়াল চুপচাপ একপাশে বসে আছে।

অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে, আবার কি হলো? ওভাবে বসে আছ যে? নতুন জীবন কেমন লাগছে?"

মিটিমিটি চোখে বিড়াল বললে, "বিশেষ ভাল না, প্রভু।"

"ভাল না! কেন? পৃথিবীতে এমন কোন্ বিড়াল আছে, যে তোমার চেয়ে শক্তিমান?"

সামনের দুই থাবা জোড় করে বিড়াল বললে, "তা নেই সত্যি। কিন্তু প্রভু, নতুন আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। আপনি তপস্যায় গেলে রোজ একদল কুকুর আসে এখানে। তাদের সে কী ভয়ঙ্কর চীৎকার! ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়, ঘরের বের হতে পারি নে।"

চিন্তিত মুখে ঋষি বললেন, "বটে!"

ঋষির পায়ে গড় হয়ে বিড়াল বললে, "প্রভু, আপনার দয়ার কথা বলে শেষ করা যায় না। সামান্য এক ইঁদুর ছিলাম! আপনার

দয়ায় কথা বলার ক্ষমতা পেলাম। আজ বিড়াল হয়েছি। যদি রাগ না করেন তো, আমার আর একটা প্রার্থনা আছে—বলি।"

বিড়ালের কথা বলার ক্ষমতা দেখে ঋষি হেসে ফেললেন, তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললেন, "অতো ভণিতার দরকার নেই—বলো।"

বিড়াল বললে, "প্রভু, আমায় কুকুর করে দিন।"

"তথাস্তু!"

সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল এক প্রকাণ্ড কুকুরে পরিণত হলো।

দিন যায়। নতুন জীবনে কুকুরের আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। নির্ভয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। কুটিরে, কুটিরের বাইরে, তপোবনের সর্বত্র তার অবাধ গতি। ভয়ে কোন জীব তার কাছেও আসে না।

কিন্তু যত দিন যায়, তার আনন্দে ততই ভাঁটা পড়তে থাকে। প্রকাণ্ড জানোয়ার সে—ঋষির উচ্ছিষ্ট খেয়ে আজ আর তার পেট ভরে না; তাই দিনের খাবার যোগাড় করতে তাকে কতই না পরিশ্রম করতে হয়! অথচ গাছের উপরে বানরদের সে দেখে—ওসব বালাই-ই নেই তাদের। গাছ ভরতি পাকা পাকা রসাল ফল তারা পেট ভরে খায় আর মনের স্ফূর্তিতে চেঁচামেচি লাফালাফি করে সময় কাটায়।

কুকুর সতৃষ্ণ নয়নে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে, 'আঃ! কী আনন্দেই না ওরা দিন কাটায়! জীবন বটে ওদের!'

ক্রমে ক্রমে কুকুর-জীবনের উপর তার যৎপরোনাস্তি বিতৃষ্ণা ধরে যায়। কোন কিছুই আর ভাল লাগে না।

শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে মুখ ভার করে সে আবার গিয়ে দাঁড়ালো ঋষির কাছে।

ঋষি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে, খবর কি? মুখ ভার কেন?"

ঋষির পায়ে লুটিয়ে পড়ে অনেক ভণিতার পর কুকুর বললে, "প্রভু, এই নতুন জীবনে বড় কষ্টে পড়েছি।"

"কষ্ট? কিসের?" ঋষি জিজ্ঞেস করলেন।

ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে কুকুর আবার ভণিতা শুরু করতেই ঋষি বাধা দিলেন, "ওসব রাখো। কষ্টটা কি বলো।"

কুকুর বললে, "প্রভু, এত বড় জানোয়ার আমি, অল্প খাবারে আজ আর আমার পেট ভরে না। সে খাবার যোগাড় করতে আমাকে যে কতখানি কষ্ট পোহাতে হয়, তা আর কি বলবো! অথচ গাছের উপরে বানরদের দেখি—ওসব ঝামেলাই তাদের নেই। হাতের কাছে পাকা পাকা রসাল ফলে পেট ভরতি করে কেমন মহানন্দে তারা দিন কাটায়। তাই প্রভু, আপনার কাছে আমার আর একটা প্রার্থনা: আমায় বানর করে দিন।"

*ঋষি কি ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর—*

কুকুর বানর হলো।

নতুন বানর পুলকে যেন আত্মহারা। গাছে গাছে লাফালাফি করে, ডালপালা ভেঙে, আকণ্ঠ ফল খেয়ে, অন্য বানরদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করেও তার সাধ যেন মেটে না।

এমনিভাবে বসন্তকাল কেটে গেল। বসন্তের পরে এল গ্রীষ্ম। আর গ্রীষ্মের সঙ্গে এল যেমন খরা, তেমনি অনাবৃষ্টি। গরমে নতুন বানরের শরীর আইঢাই করে। পিপাসা পায় ঘন ঘন। অথচ আগের মতো আর যেখানে-সেখানে জল মেলে না। অনাবৃষ্টির ফলে বেশির ভাগ খাল বিল পুকুর প্রায় শুকিয়ে গেছে, নদীর জলও নেমে গেছে অনেক নীচে। জল খাওয়া নতুন বানরের পক্ষে এক বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো।

গরমে আর তেষ্টায় এমনি যখন তার অবস্থা, তখন বুনো শুয়োরদের কিন্তু ভারী স্ফূর্তি। সারা দিন তারা জলে কাদায় খেলা

করে বেড়ায়, ঠাণ্ডা জলে গা ডুবিয়ে আরামে পড়ে থাকে। গরমের কষ্ট তাদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারে না।

বানরটি তাদের দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে—'আঃ। কী আরামের জীবন ওদের! বানর না হয়ে আমার শুয়োর হওয়াই উচিত ছিল।'

মনের কষ্টে হা-হুতাশ করে কিছু দিনের মধ্যেই সে বেশ কাহিল হয়ে পড়লো। খাওয়াদাওয়া খেলাধুলোয় আগের মতো আর রুচি রইল না।

শেষে আবার একদিন সে হাত জোড় করে গিয়ে দাঁড়ালো ঋষির কাছে।

তারপর আবার সেই ভণিতা। ঋষি ধমক দিতে সে কাজের কথা পাড়লো। বললে, "প্রভু, অসন্তুষ্ট না হন তো আমার আর একটা প্রার্থনা আপনাকে নিবেদন করি।"

"করো।" ঋষির কণ্ঠে কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে উঠলো।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বানর বললে, "প্রভু, আমায় শুয়োর করে দিন।"

ঋষি কি আর করেন! আদুরে জন্তুটির জন্যে তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তাই খানিক ইতস্ততঃ করে বললেন, "তথাস্তু"।

নতুন জীবন পেয়ে নতুন শুয়োর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না সেখানে। ক্ষুদে লেজটা নাড়তে নাড়তে নতুন উন্মাদনায় সে ছুটলো দূরের এক বিলের দিকে।

সাধারণ শুয়োরদের চেয়ে আকারে সে অনেক বড়—মহাকায় বরাহবিশেষ। গায়ের জোরও তার তেমনি। তাই কয়েক দিনের মধ্যেই সে শুয়োর-দলের সর্দার হয়ে দাঁড়ালো।

দলবল নিয়ে সারা দিন সে খালে বিলে পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি দাপাদাপি করে বেড়ায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে পড়ে থাকে। নতুন জীবনের নতুন আনন্দ সে উপভোগ করে অন্তর ভরে।

কিছুকাল পরে······

সে দেশের রাজা একদিন বনে এলেন শিকার করতে। সঙ্গে বহু লোকজন সৈন্যসামন্ত। হাতীর পিঠে চড়ে তিনি বনবাদাড় তছনছ করে ঘুরতে লাগলেন। কত জন্তু-জানোয়ার যে মারা পড়লো, তার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের শুয়োর-দলপতি তখন দলবল নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে এক বিলে বাস করছিল। শিকার করতে করতে রাজা এক সময় সেখানে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে সঙ্গে তীর ছুটলো বৃষ্টিধারার মতো। শুয়োরদের করুণ চীৎকারে বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠলো।

আমাদের দলপতির ভাগ্যের জোর বলতে হবে, সে বেঁচে গেল অতি অল্পের জন্যে। সে তখন বনজঙ্গল ভেঙে পাগলের মতো ছুটছে। ছুটছে আর ভাবছে, ভাবছে আর ছুটছে—'আঃ! বড় বাঁচা বেঁচে

গেছি! পর পর দুটো তীর কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। আর একটু হলেই—ফরসা!'

রাজহস্তীর চেহারাটা বারবার তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতে লাগলো—সত্যি, জীবনের মতো জীবন বটে রাজার ওই হাতীটার! যেমন চেহারা, সওয়ারও তেমনি। আর কী সাজসজ্জা! পিঠের উপর ঝলমলে রঙ-বেরঙের আসন। তার উপর সওয়ার হলেন কিনা দেশের এত বড় শক্তিমান রাজা!'

এমনি করে ভাবতে ভাবতে আর ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার পরে সে এসে পৌঁছলো ঋষির কুটিরে। এসেই হুমড়ি খেয়ে কেঁদে পড়লো তাঁর পায়ে। ভয়ে ও পরিশ্রমে সে তখন আধমরা। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না।

ঋষি তাকে আশ্বস্ত করে তার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে শিউরে উঠলেন। শুয়োর ডুকরে কেঁদে উঠলো, "প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন। আমায় হাতী করে দিন।"

তৎক্ষণাৎ ঋষি তার মনস্কামনা পূরণ করলেন।

নতুন হাতী দিনরাত বনে বনে ঘোরে আর ভাবে, কিভাবে রাজার চোখে পড়বে। কত রকম বুদ্ধি আসে মাথায়, কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হয় না।

শেষে অনেক প্রতীক্ষার পর এক দিন এল সেই সুযোগ। রাজা আবার এক দিন বনে এলেন শিকার করতে। দূর থেকে হাতীটাকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। তাঁর সঙ্গীদেরও সেই অবস্থা। কী বিরাট কী সুন্দর হাতী! চলার ভঙ্গীটাই বা কি চমৎকার!

রাজা হুকুম দিলেন তাকে ধরবার জন্যে।

হাতী যে সহজেই ধরা দিল, তা বুঝতেই পারছো! পোষ মানলো সে আরো সহজে। তার বুদ্ধি দেখে রাজা এত মোহিত হলেন যে, সেই দিন থেকে সে বহাল হলো রাজহস্তীর পদে।

রাজার আদর-যত্নে আর রাজসিক আরামে হাতীর জীবন ধন্য হলো।

এর কয়েক দিন পরে……

রানীর একদিন সখ হলো, গঙ্গাস্নানে যাবেন। রাজার হুকুমে সিপাহী-সান্ত্রী সাজলো। অপরূপ সাজে সাজানো হলো নতুন রাজ-হস্তীকে। তার পিঠে চড়ে রাজাও যাবেন রানীর সঙ্গে।

খবর শুনে হাতী মহা খুশী ঃ রাজা উঠবেন তার পিঠে! এত দিনের মনোবাঞ্ছা তার পূর্ণ হবে!

কিন্তু এ কি!—যাত্রার আগে হাতী হঠাৎ চমকে উঠলো—রানী উঠছেন তার পিঠে? এঁ্যা! তার পিঠে উঠবে কিনা একজন স্ত্রীলোক? কী লজ্জা! কী লজ্জা! হলেনই বা উনি রানী, কিন্তু সে-ই বা কম কিসে? সে রাজহস্তী—গজেন্দ্র!

রানী তখন তার পিঠের উপর উঠছিলেন। হাতীর আর সহ্য হলো না। চীৎকার করে সে লাফিয়ে উঠলো। রানী ছিটকে পড়লেন দূরে। সবাই হায় হায় করে ধেয়ে এল। রাজা ছুটে এসে রানীকে বুকে তুলে নিলেন। চারিদিকে চীৎকার উঠলো—'পালাও! পালাও! রাজহস্তী খেপে গেছে!'

রাজার ঐকান্তিক সেবা-যত্নে রানী সুস্থ হলেন বটে, কিন্তু রাজহস্তী বুঝি সত্যিই খেপে গেল। ভয়ঙ্কর চীৎকারে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে রাজপুরী ছেড়ে সে ছুটলো বনের দিকে।

আজ তার সমস্ত ধারণা পালটে গেছে। এত দিন সে ভাবতো, রাজহস্তীই বুঝি রাজার সবচেয়ে আদরের। কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখলো, কত মিথ্যে সে ধারণা। রানীই শুধু পায় রাজার সত্যিকারের আদর-ভালবাসা। রানীর জীবনই সার্থক জীবন।

ছুটতে ছুটতে সন্ধ্যার পরে সে এসে পৌঁছলো ঋষির কুটিরে।

ঋষি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "কি খবর হে? তুমি অসময়ে এখানে? রাজার হাতিশাল ছেড়ে এলে যে?"

তাঁর পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ে হাতী কেঁদে ফেললে, তার পর ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জলে ভেসে তার দুঃখের কথা শেষ করে শেষে বললে, "প্রভু, আমায় সুখী করার জন্যে আপনি কত কি করলেন! কিন্তু সুখশান্তি আমার অদৃষ্টে নেই। আজ প্রভু, আপনার কাছে আমি শেষবারের মতো প্রার্থনা জানাতে এসেছি, আর কোনো দিন উত্যক্ত করবো না—আমায় আপনি রানী করে দিন।"

ঋষি গরম হয়ে উঠলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "অসম্ভব! মূর্খ জানোয়ার, তুমি জানো না, কি বলছো। তোমার এ অসম্ভব প্রার্থনা কখনই পূরণ হতে পারে না। তোমাকে রানী করতে হলে রাজা চাই, রাজ্য চাই। সে সব আমি কোথায় পাবো?"

হাতী কোন উত্তর দিল না। ঋষির পায়ের কাছে মাথা রেখে নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ধীরে ধীরে ঋষির মন নরম হয়ে এল। শেষে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে তিনি বললেন, "বাপু, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই, কিন্তু তা বলে রানী করাও সম্ভব নয়। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি। তোমাকে আমি পরমাসুন্দরী এক মেয়েতে পরিণত করতে পারি। তার পরে তোমার ভাগ্য। কোন রাজা যদি তোমাকে দেখে বিয়ে করেন, তাহলেই তোমার সাধ পূর্ণ হবে—তুমি রানী হতে পারবে।"

হাতী সানন্দে তাতেই রাজী হলো।

পরক্ষণে কোথায় মিলিয়ে গেল বিরাটবপু সেই কুৎসিত জানোয়ার! তার জায়গায় দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ রূপসী মেয়ে। ঋষি তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। রাজার মনমাতানো রূপই বটে! মেয়ের নাম রাখলেন তিনি পোস্তমণি।

পোস্তমণি ঋষির কুটিরে থাকে, তাঁর মেয়ের মতো আশ্রমের যত্ন নেয়, ঋষির সেবাশুশ্রূষা করে। আর অবসর সময়ে কুটিরের দরজায় বসে থাকে।

এমনিভাবে দিন যায়।

একদিন ঋষি নিত্যকার মতো তপস্যায় বেরিয়ে গেছেন, পোস্তমণি দরজায় বসে আছে, এমন সময় সে দেখলো, বন থেকে বেরিয়ে আসছে মূল্যবান জমকালো পোশাকপরা একজন অশ্বারোহী। অশ্বারোহী রূপবান—দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক।

পোস্তমণি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে কুটিরে অভ্যর্থনা জানালো।

আগন্তুক মুগ্ধ। নিষ্পলক চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন পোস্তমণির দিকে। তার পর খেয়াল হতেই ঘোড়া থেকে নেমে কুটিরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "এ দিকে শিকারে এসেছিলাম। একটা হরিণের পিছনে ছুটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রামের স্থান খুঁজছিলাম। এখানে পাব কি? সঙ্গের লোকজন বহু পিছনে পড়ে আছে।"

মধুর হেসে পোস্তমণি বললে, "আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। অতিথি আপনি—এ কুটির আপনারই কুটির বলে মনে করবেন। এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুন, পিপাসা দূর করুন। কিন্তু আমরা বড় গরীব। আপনার মতো মর্যাদাশালী ব্যক্তির সেবা করবো, এমন সাধ্য আমাদের নেই। যদি কিছু মনে না করেন—আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

সহাস্যে যুবক বললেন, তাঁর পিতা এ অঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের সম্রাট—রাজার রাজা। আর তিনি যুবরাজ।

আনন্দে পোস্তমণির বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে এক পাত্র জল এনে সে নিজের হাতে অতিথির পা ধোয়াতে যেতেই যুবরাজ বাধা দিলেন, "না, না। এ কি করছেন আপনি? আমি জাতিতে ক্ষত্রিয় আর আপনি ঋষি-কন্যা। আপনি আমার পা ধোয়াবেন কি!"

পোস্তমণি বললে, "না যুবরাজ, আমি ঋষি-কন্যা নই, এমন কি ব্রাহ্মণ-কন্যাও নই। তাই আপনার পা স্পর্শ করলে কোন দোষ নেই। তা ছাড়া আপনি পূজনীয় অতিথি, আপনার সেবা করা আমার ধর্ম।"

পোস্তমণির কথা শুনে যুবরাজের মন আনন্দে নেচে উঠলো, বললেন, "আমার স্পর্ধা মাফ করবেন, দেবী—কোন্ বর্ণে আপনার জন্ম জানতে পারি কি ?"

নতমস্তকে পোস্তমণি বললে, "শুনেছি, আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যুবরাজ বললেন, "ক্ষমা করবেন দেবী, আপনার বংশ-পরিচয় জানবার বড় ইচ্ছা হয়েছে। অবশ্য আপনার অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও সুমার্জিত ব্যবহারে মনে হয়, আপনি রাজকুলোদ্ভবা।"

পোস্তমণি কোন উত্তর না দিয়ে ধীরমন্থর পদে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এল এক পাত্র সুমিষ্ট ফলমূল নিয়ে। যুবরাজ বললেন, "না দেবী, আমার কথার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই আমি স্পর্শ করবো না।"

নতমস্তকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পোস্তমণি বললে, "যুবরাজ, এ হতভাগিনীর বংশ-পরিচয় জেনে আপনার কী লাভ হবে জানি নে। তবে যা শুনেছি, সংক্ষেপে বলছি। আমার পিতা রাজা ছিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁর রাজ্য ছিল, জানি নে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমার জননীকে নিয়ে এক-বস্ত্রে তিনি বনে পালিয়ে আসেন। সেখানে বাঘের কবলে তাঁর প্রাণ যায়। এই সময় আমারও জন্ম হয়। কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট যে, পৃথিবীর বুকে আমি যখন প্রথম চোখ খুললাম, জননীও সেই সময় চিরতরে চোখ বুজলেন। যে গাছের তলায় আমার জন্ম হয়, তার ডালে একখানা মৌচাক ছিল। শুনতে আশ্চর্য লাগে, সেই মৌচাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু আমার মুখে ঝরে পড়তো, আর তাই থেকে জীবনদীপ আমার টিকে ছিল। তার পর এই মহানুভব ঋষি আমায় দেখতে পেয়ে আশ্রমে এনে লালন-পালন করেন। এই হলো

অভাগিনীর জীবনের ইতিহাস।” বলতে বলতে পোস্তমণি অঝোরে কেঁদে ফেললে।

যুবরাজের অন্তরও সমবেদনায় ভরে উঠেছিল। পোস্তমণির একখানা হাত নিজের দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন, “না দেবী, তুমি অভাগিনী নও। কেঁদো না। পৃথিবীর তুমি সেরা সুন্দরী—প্রিয়ভাষিণী। শ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজপ্রাসাদ তোমায় পেয়ে ধন্য হবে।”

শুনতে শুনতে পোস্তমণির ইচ্ছা হলো, যুবরাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করলো।

তার পর ঋষির কুটিরে গান্ধর্ব মতে মালা বদল করে নিরালায় বিয়ে হলো দুজনার।

দিনের শেষে ঋষি কুটিরে ফিরতে যুবরাজ বিদায় নিলেন তাঁর কাছ থেকে। তার পর পোস্তমণিকে নিয়ে লোকজন সমভিব্যাহারে মহা ধুমধামের সঙ্গে তিনি ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।

দিন যায়।

কৃতার্থ পোস্তমণি। তার জীবন সার্থক। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় যুবরাজ সিংহাসনে বসেছেন। পোস্তমণি হয়েছে তাঁর পাটরানী—প্রধানা মহিষী।

নতুন রাজার সে নয়নের মণি। এক মুহূর্ত সে চোখের আড়াল হলে রাজার অস্থিরতার সীমা থাকে না। বিলাসে ব্যসনে হাসি-আনন্দে পোস্তমণির জীবন ভরপুর। এতটুকু দুঃখ নেই কোথায়ও।

কিন্তু নিয়তির খেলা কে বুঝবে, বলো! হঠাৎ একদিন কোথা দিয়ে কী যে ঘটে গেল, আজো তা কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না।

## চিরস্মরণীয়া পোস্তমণি

সেদিন পোস্তমণির কি খেয়াল হয়েছিল—রাজোদ্যানে একটা গভীর কুয়ো ছিল, হাঁটতে হাঁটতে সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পরেই কি হলো কেউ বলতে পারে না, পোস্তমণি হয়তো ঝুঁকে কুয়োর ভিতরে একবার তাকিয়েছিল, তাই হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল—টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে।

চীৎকার করে সবাই ছুটে এল। খবর শুনে রাজা ছুটে এলেন হায় হায় করতে করতে। এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড। পুরীময় শুধু হইচই, চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি। কুয়ো থেকে পোস্তমণিকে তুলবার চেষ্টা চললো বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে মারা গেছে।

রাজার চোখে নামলো অন্ধকার আর অশ্রুর বন্যা। রানীকে হারিয়ে তাঁর বেঁচে থাকার আর এতটুকু ইচ্ছা নেই। বারে বারে তিনি আত্মহত্যা করতে যান, আর মন্ত্রী কোটাল পারিষদ্‌বর্গ তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

এমনি যখন রাজা ও রাজপুরীর অবস্থা, তখন ধীরে ধীরে রাজসভায় এসে হাজির হলেন পোস্তমণির পালকপিতা—সেই ঋষি। পোস্তমণি মারা গেছে শুনে তিনি এসেছেন।

রাজার অবস্থা দেখে ক্ষণেকের জন্যে তাঁর মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "মহারাজ, শান্ত হোন—নিয়তির উপর কারো হাত নেই। বৃথা শোক করে বা নিজের জীবন নষ্ট করে কোন লাভ হবে কি? আত্মহত্যা যে কত বড় পাপ, আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু মহারাজ, শুধু এই কথা বলবার জন্যেই আমি আসি নি। এসেছি অদ্ভুত একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবার জন্যে।"

রাজসভা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। ঋষি বলতে লাগলেন, "মহারাজ, আপনার এই মৃতা রানীর পরিচয় আপনি জানেন কি? সে যে পরিচয় আপনাকে দিয়েছিল, তা সবই মিথ্যা। আপনি তাকে নিয়ে বিয়ের

আগে ও পরে এত মত্ত ছিলেন যে, আমার কাছে তার কুলশীল-পরিচয় জিজ্ঞেস করার কথা একবারও আপনার মনে হয় নি। সেই কথাটা আজ বলতে এসেছি। শুনলে আপনি শোক ভুলে যাবেন।"

এক মুহূর্ত থেমে ঋষি আবার বললেন, "মহারাজ, আপনার মহিষীর রাজবংশে জন্ম হয় নি, এমন কি মনুষ্যকুলেও তার জন্ম নয়, তার জন্ম হয়েছিল মূষিককুলে। সে ছিল সামান্য একটা ইঁদুর।"

এ্যাঁ!

সিংহাসন থেকে পড়তে পড়তে রাজা সামলে নিলেন। কিন্তু মন্ত্রী কোটাল পারিষদ্‌বর্গ পারলে না।

"তার নাম রেখেছিলাম কুট্টুর।" ঋষি বললেন।

এ্যাঁ! তাদের পাটরানী কুট্টুর !!

রাজসভা চিতপাত।

হাজার বার বাজ পড়লেও বুঝি মানুষের এমন সর্বনাশ হয় না!

রাজা অসাড়, রাজসভা নিঃসাড়। রাজার চোখের জল কখন যে শুকিয়ে গেছে, কেউ তা টেরও পায় নি।

চারিদিকে তাকিয়ে ঋষি বললেন, "হ্যাঁ, আশ্চর্য হবার কথাই বটে।"

তারপর একে একে তিনি সমস্ত ইতিহাস বলে গেলেন, থামলেন এসে হাতীতে।

ইতিমধ্যে সকলে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—তারপর?

"তার পর হাতী থেকে পোস্তমণি।" ঋষি বললেন, "হাতীর শেষ প্রার্থনা মতো তাকে আমি পরমাসুন্দরী এক মেয়েতে রূপান্তরিত করলাম, নাম রাখলাম পোস্তমণি। তার পরের সব ঘটনা আপনিও জানেন, মহারাজ।"

আর 'জানেন মহারাজ'! মহারাজার তখনকার অবস্থা যদি দেখতে! জবুথুবু রাজার চোখের সামনে তখন ভাসছে—এক ইঁদুর!

ঋষি বলে চললেন, "যা হবার, তা হয়ে গেছে, মহারাজ। অতীত ভুলের জন্যে অনুতাপ করা বৃথা। আপনি সুস্থ হোন, আবার বিয়ে করে সুখী হন। আর সেইসঙ্গে আমিও একটা কাজ করতে চাই। কিছু মনে করবেন না—আমার যশস্বিনী কন্যা পোস্তমণির নাম আমি চিরস্মরণীয় করতে চাই। এমন ঘটনা অতীতে কখনো ঘটে নি, ভবিষ্যতেও আর ঘটবে না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, পোস্তমণির দেহ কুয়ো থেকে তুলবেন না, মাটি দিয়ে কুয়োটা ভরাট

করে দিন। কিছু দিন পরে দেখবেন, পোস্তমণির রক্তমাংসমজ্জা থেকে একটা গাছ গজিয়েছে। পোস্তমণির নামানুসারে গাছটির নাম রাখবেন পোস্তগাছ। এই গাছের ফল হবে পোস্তদানা। তার নির্যাস থেকে অত্যাশ্চর্য এক পদার্থ তৈরী হবে। লোকে তার নাম রাখবে অহিফেন বা আফিম। আফিমের মতো অদ্ভুত বস্তু অতীতে হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। পৃথিবীর বুকে যত দিন মানুষ থাকবে, তত দিন নেশার জিনিস হিসাবে আফিমের মৃত্যু নেই। এটা যে কোনভাবে —অর্থাৎ বড়ি করে, জলে গুলে বা তামাকের মতো আগুনে পুড়িয়ে— খাওয়া চলবে। আর তা খেলেই নেশা হবে।"

নিস্তব্ধ রাজসভা লোকে লোকারণ্য—হতভম্বের মতো সবাই বসে আছে। ঋষি বলে চললেন, "কিন্তু আফিমখোরদের অর্থাৎ যারা আফিমের নেশা করবে, তাদের প্রকৃতি সাধারণ মানুষের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন ধরনের হবে। তাদের চরিত্রে পোস্তমণির চারিত্রিক গুণগুলি আত্মপ্রকাশ করবে। যেসব প্রাণীতে পোস্তমণি রূপান্তরিত হয়েছিল, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও দেখা দেবে আফিমখোরদের চরিত্রে।

"তারা হবে ইঁদুরের মতো পরশ্রীকাতর ও অপকারী, বিড়ালের মতো দুগ্ধপ্রিয় ও চোর, কুকুরের মতো ঝগড়াটে ও পদলেহী, বানরের মতো অনুকরণপ্রিয় ও অস্থিরমতি, বুনো শুয়োরের মতো একগুঁয়ে ও হিংস্র, হাতীর মতো আলসে ও জড়বুদ্ধি, আর রানীর মতো দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী। তা ছাড়া পোস্তমণির মতো তারাও কখনো নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে চাইবে না।"

বলতে বলতে ঋষি ধীর পদে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর রাজা ও রাজসভা ঘোলাটে চোখে বসে রইল হাত পা ভাঙা কাঠের পুতুলের মতো।

আর সেই থেকে আফিমের আবির্ভাব ঘটলো পৃথিবীতে।

# নামের ফ্যাসাদ

ছাত্রটির মনে শান্তি নেই। কত সে চেষ্টা করে, তবু পড়াশুনায় মন বসাতে পারে না। অথচ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এমন যে কেন্দ্র তক্ষশিলা নগরী, তার শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের ছাত্র সে। অধ্যাপকের নামে সকলে মাথা নোয়ায়। পাঁচ শো ছাত্র তাঁর আশ্রমে লেখাপড়া শেখে। আশ্রমের শান্ত শীল পরিবেশে তারা জ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকে—কেবল ওই ছাত্রটি ছাড়া। মনে তার বড় দুঃখ। অথচ সে-দুঃখের কথা কাউকে সে মুখ ফুটে বলতেও পারে না।

এজন্যে দায়ী তার বাবা-মা। জগতে এত ভাল ভাল নাম থাকতে তাঁরা কিনা ভেবে চিন্তে শেষে তার নাম রাখলেন 'পাপক'! এমনি নাম যে, কারো কাছে বলা তো দূরের কথা মুখেও আনা যায় না। আর সহপাঠীরা তো ফাঁক পেলেই তার পিছনে লাগে—নাম নিয়ে ছড়া কাটে, সময় অসময় নেই, যেখানে সেখানে 'পাপক! পাপক!' বলে চেঁচাতে থাকে।

প্রথম প্রথম সে চটে উঠতো, সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতো। কিন্তু এখন আর কথা বলে না। শুকনো মুখে নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু কাজেও কি ছাই মন বসে! তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, নামের জন্যেই জীবনটা তার মাটি হয়ে গেল। অলক্ষুনে ঐ নামটা থাকতে জীবনে তার বড় হবার কোন আশাই নেই।

দিনরাত সে ভাবে। ভেবে কূলকিনারা পায় না। আর ততই দুঃখ ও হতাশায় মন তার মুষড়ে পড়ে। কি করবে, কাকে সে বলবে তার এই মনস্তাপের কথা?

শেষে অনেক ভেবে চিন্তে একদিন সে গিয়ে হাজির হলো গুরুদেবের কাছে। সবাই চলে যাবার পরও পাপক শুকনো মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "কি খবর, পাপক? কিছু বলবে আমাকে?"

এই মুহূর্তে গুরুদেবের মুখেও 'পাপক' নাম শুনে লজ্জা-সঙ্কোচে সে যেন মাটির সঙ্গে আরো মিশে গেল। শেষে অনেক কষ্টে বললে, "গুরুদেব, অনেক দিন যাবৎ ভাবছি, আপনাকে বলবো। নিজেও অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু পথ পাই নি। আজ তাই আপনার কাছে এসেছি। গুরুদেব, আমার নামটা বড় অপয়া—অলক্ষুনে। এ নাম থাকতে জীবনে আমি কখনই প্রতিষ্ঠা পাব না। তাই আপনার চরণে নিবেদন করতে এসেছি, এই নামটা পালটে আমার অন্য একটা ভাল নাম আপনি রেখে দিন।"

পাপকের কথা শুনে গুরুদেব অবাক হলেন বটে, কিন্তু শিষ্যের ব্যথা বুঝতে তাঁর দেরি হলো না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি সস্নেহে বললেন, "বেশ তো। নাম পালটাতে চাও, তাতে লজ্জার কি আছে! কিন্তু কি নাম রাখবে, ঠিক করেছ? করো নি? তা দেখ, নতুন নাম ঠিক করা কি আমার পক্ষে উচিত হবে? তার চেয়ে এক কাজ করো। লোকালয় ঘুরে তুমিই বরং এমন একটা নাম পছন্দ করে আনো, যা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে মনে করো। তোমাকে আমি ছুটি দিচ্ছি। ফিরে এসে তুমি যে নাম বলবে, সেই নামই আমি রেখে দেব।"

পাপক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। যাক্! গুরুদেব আবার কি নাম রাখতেন, কে জানে!

খুশী মনে আচার্যকে প্রণাম করে তখুনি সে বেরিয়ে পড়লো।

পাপক চলেছে।

কত গ্রাম, কত জনপদ সে ঘোরে। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়। একথা সেকথার পর তাদের সে নাম জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কোন নামই ঠিকমতো পছন্দ হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এসে হাজির হলো এক শহরে। রাজপথ দিয়ে চলেছে, হঠাৎ দেখে—একদল লোক এক মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে চলেছে।

নাম জিজ্ঞেস করা পাপকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্মশান-যাত্রীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললে, "দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

শ্মশানযাত্রীরা একটু আশ্চর্য হয়ে অপরিচিত তরুণ প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালে।

পাপক বললে, "আচ্ছা, যিনি মারা গেছেন, তাঁর নামটা কি ছিল?"

শ্মশানযাত্রীরা অবাক : এ কী উদ্ভট প্রশ্ন !

উষ্ণ কণ্ঠে একজন উত্তর দিল, "জীবক।"

"জীবক !" পাপক চমকে উঠলো, "জীবক নাম এঁর, তবু মরণ হলো ?"

আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথায় শ্মশানযাত্রীরা এমনিতেই কাতর, তার উপর পাপকের কথায় যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়লো : ছেলেটা এমনি বর্বর যে, শোক নিয়ে ঠাট্টা করছে !

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি দুপা এগিয়ে এসে জ্বলন্ত চোখে বললেন, "কে হে তুমি, ছোকরা ? মানুষের বাচ্চা নও বোধহয়। জীবক মরে না মানে ? জীবকও মরে, অজীবকও মরে। মরা-বাঁচা নামের উপর নির্ভর করে—একথা তোমায় কে বললে, হাঁদারাম ? নাম তো কেবল কোন কিছুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। এত বয়েস হলো, এখনো এই কথাটা শেখো নি, উল্লুক ?"

গাল দিতে দিতে শ্মশানযাত্রীরা চলে গেল। পাপক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়। গভীর চিন্তায় সে ডুবে গেছে। সত্যিই কি নাম কেবল কোন কিছুকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে? নামের আর কোনই মূল্য নেই?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে সে আবার চলতে শুরু করে।···

দুপুরবেলা। হঠাৎ এক বাড়ির সামনে হট্টগোল কান্নাকাটি শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। দেখে, বাড়ির কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে তাদের এক দাসীকে বেদম মারছে।

পাপক এগিয়ে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "এভাবে ওকে মারছেন কেন?"

তার দিকে দৃক্‌পাত না করে মারতে মারতে কর্তা জবাব দিল, "মারবো না? মারবো না তো কি ফুল-চন্নন দিয়ে পুজো করবো? বেটী কুঁড়ের হদ্দ—একটা পয়সাও আজ রোজগার করে নি।"

যে সময়ের কথা বলছি, তখন গোরু-ঘোড়া ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষও হাটে-বাজারে কেনাবেচা হতো। সেসব মানুষকে বলা হতো ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। নিজের বলতে তাদের কিছুই থাকতো না। অনেক সময় মালিক তাদের দিয়ে বাইরে থেকে উপার্জনও করাতো। সেসবই হতো মালিকের সম্পত্তি। এমন কি তাদের জীবন পর্যন্ত মালিকের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করতো।

পাপকের অভ্যাস যাবে কোথায়! কর্তার কথা শুনে সে দুম্‌ করে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, ওর নামটা কি?"

কর্তা-গিন্নী থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণে ভেংচি কেটে কর্তা বললে, "কে হে বটে তুমি? হঠাৎ এর নাম জানার কি দরকার হলো তোমার? এর নাম ধনবতী। হয়েছে? আচ্ছা, এবার আসতে আজ্ঞা হোক।"

"এ্যাঁ! ধনবতী?" পাপক যেন আকাশ থেকে পড়লো, বললে, "নাম ধনবতী—অথচ একটা কানাকড়ি দেবারও এর ক্ষমতা নেই? ভারি আশ্চর্য তো!"

কর্তা-গিন্নী একেবারে থ'। দাসী পর্যন্ত কান্না ভুলে হাঁ হয়ে গেল। আর কর্তা পাপকের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় রুখে উঠলো গিন্নীর উপর, "কেমন? বলি নি কতবার, 'গিন্নী, দরজা খুলে কাজ কোরো না, দরজা খুলে কাজ কোরো না। ফ্যাসাদ বাধবে।' এইবার বোঝ! যত্তো সব পাগলছাগলের কাণ্ড! বলে কিনা, 'এ্যাঁ, নাম ধনবতী, অথচ কানাকড়ি দেবারও এর ক্ষমতা নেই!' কী আপদ রে বাবা!"

বলতে বলতে কর্তার মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠলো, পাপকের দিকে ফিরে বললে, "বলি, হাঁহে বাপু! বয়েসটা তো তোমার কম

হলো নি, অথচ আজো এটুকু আক্কেল হলো নি যে, নাম ধনবতীই হোক আর অধনবতীই হোক, তাতে কি আসে যায়? ভাল ভাল গালভরা নামে কারো পেট ভরেছে—এটা তুমি কোথায় শুনলে, বাপ? যে যেমন কাজ করে, তার ফলও জোটে তেমনি—এত দিনে এ কথাটাও শোনো নি, গাধারাম? আপদ! আপদ!"

বলতে বলতে কর্তা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল পাপকের মুখের উপর।

তা দিক। পাপকের খেয়াল নেই সেদিকে। নিজের চিন্তায় সে ডুবে গেছে: তাহলে নামের কি কোনই মূল্য নেই? যে যেমন কাজ করে, তার ফলও জোটে তেমনি! তাই ধনবতী কাঙাল হয়, জীবকের মৃত্যু হয়? তাহলে নাম পালটানোর জন্যে কেন সে ঘুরে মরছে এভাবে?

ভাবতে ভাবতে পাপক শহর ছেড়ে মাঠের পথ ধরে। কিছুদূর যেতেই এক চৌমাথা। পাপক দেখে, একজন লোক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

পাপক কাছে গিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে, মশাই? একা একা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে এভাবে কি দেখছেন?"

বিরক্তির সঙ্গে লোকটি বললে, "দেখবো আবার কি? পথ হারিয়ে গেলে, মানুষ যা দেখে, তাই দেখছি।"

ফস্ করে পাপকের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "তা, মশায়ের নামটা কি, জানতে পারি?"

বলা নেই, কওয়া নেই—এ কী অবান্তর প্রশ্ন! লোকটি হকচকিয়ে গেল। তারপর বললে, "কেন বলুন তো? বাবা-মা নাম রেখেছিলেন পন্থক বা পথিককুমার।"

"এ্যাঁ! বলেন কি মশাই?" পাপক যেন লাফিয়ে উঠলো, "আপনার নাম পন্থক—পথিককুমার, আর আপনি কিনা পথ হারালেন!"

তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে সে বললে, "ভারি আশ্চর্য তো! পন্থকও পথ হারায়!"

রাগে ও অপমানে লোকটির চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাপকের শেষ কথাগুলো কানে যেতেই সে হেসে ফেললে। বুঝতে পারলে, ছেলেটি হয় পাগল, না-হয় নিরেট বোকা। কাষ্ঠ হাসি হেসে সে বললে, "বাঃ! বেশ তো বাছা, বলতে কইতে পারো! আহা, কী মাথা! কান দুটোও তো দেখছি, বেশ নজরে পড়ার মতো! তা বাবা দীর্ঘকর্ণ, তোমার কি বিশ্বাস যে, নামের উপরই সবকিছু নির্ভর করে? আজ থেকে জেনে রাখো, ওটা ঠিক নয়। নাম পথিকই হোক আর অপথিকই হোক, সবাই পথ হারাতে পারে,—নামের উপর তা নির্ভর করে না। নাম মানুষের দেওয়া, মানুষই সৃষ্টি করেছে কাজের সুবিধের জন্যে—এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে পৃথক করার জন্যে। বুঝেছো?"

নিশ্চয়ই!

হেঁট মাথায় পাপক আশ্রমের দিকে রওনা হয়। আর নয়! কত কাণ্ডই না সে করলো নামের জন্যে। পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথে পথে ঘুরছে কত দিন ধরে! অথচ পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা—সব কিছুই নির্ভর করে কাজের উপর, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের উপর।

তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আচার্য মৃদু হাসলেন। সহপাঠীরাও চুপ করে গেল সেই দিন থেকে।

# পশু ও মানুষ

কত বড় রাজা ব্রহ্মদত্ত। তাঁর হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কত মন্ত্রী কোটাল সভাসদ্। সিপাহীসান্ত্রী সৈন্যসামন্তে জম-জম করে রাজপুরী।

এত বড় রাজ্যের এত বড় রাজা—ব্রহ্মদত্ত! কিন্তু তাঁর ছেলে মাত্র একটি।

রাজা-রানীর সে চোখের মণি, আদরের তুলাল। তার আবদার রাখতে সমস্ত দাসদাসী—মায় সারা রাজপুরী হিমসিম খেয়ে যায়। ছেলে তো নয়, যেন মূর্তিমান বিচ্ছু। রাজা-রানী আদর করে তার নাম রাখেন তুষ্টকুমার।

নামের সঙ্গে স্বভাবের ওরকম মিল কদাচিৎ চোখে পড়ে। তুষ্টকুমার যত বড় হয়, রাজ্যের লোক ততই হাড়ে হাড়ে টের পায়

এটা। রাজার ছেলে হয়েও শাস্ত্র বা শস্ত্রবিদ্যা কোন বিদ্যাই সে শিখলো না। রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ তার অত্যাচারে।

তার কাছে ছোটবড় সবাই সমান—লোকের মানপ্রতিপত্তি বা বয়সের বাচবিচার নেই। যাকে তাকে যখন তখন সে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করে, রেগে গেলে সময় সময় উত্তম-মধ্যম দিতেও ছাড়ে না। ফলে, তাকে আসতে দেখলে লোকে যেন রাক্ষস দেখেছে—এমনিভাবে পালিয়ে প্রাণ ও মান দুই-ই বাঁচায়। কারো কিছু বলারও উপায় নেই। রাজার ছেলে!—তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেছো কি, সোজা গর্দান! তাই মুখ বুজে সবাইকে সব সইতে হয়।

এর ফলে, রাজা-রানী ছাড়া রাজ্যে এমন একটি সৎ লোক নেই, যে তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে, সারাক্ষণ তার মৃত্যু কামনা না করে।

এমনি করে সবাই যখন জ্বলছে, তখন হঠাৎ একদিন দুষ্টকুমারের শখ হলো, নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটবে। হাজার রকমের শখ, হাজার রকমের খেয়াল তার। আর তা পূরণ হতে মুহূর্তেরও তর সয় না।

সুতরাং ইয়ারবন্ধু, চাকরবাকর নিয়ে, চারিদিক সচকিত করে দুষ্টকুমার গেল নদীতে।

সাঁতার কাটতে কাটতে আবার একসময় তার কি খেয়াল হলো, চাকরদের ডেকে বললে, "এই হতভাগার দল, শোন্—নদীর মাঝখানে আমায় নিয়ে চল্, ওখানে গিয়ে সাঁতার কাটবো।"

পাহাড়ী নদী—মাঝ নদীতেও জল অল্প, বড় জোর মাথা জল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুষ্টকুমার খেলায় মেতে উঠলো।

কোনো দিকে কারো খেয়াল নেই।

হঠাৎ একসময় মেঘের গর্জন কানে যেতেই তারা চমকে উঠলো। দেখলো, চারিদিক অন্ধকার করে এসেছে। কালো কালো

মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। রুদ্ধ আক্রোশে তারা ফুঁসছে—উন্মত্ত দানব বুঝি ছাড়া পেয়ে দাপাদাপি শুরু করেছে।

দেখতে দেখতে আকাশ যেন ভেঙে পড়লো মাথার উপর। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। আর সেইসঙ্গে ঘনঘন মেঘ-গর্জন, বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ভ্রূকুটি। এক হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না—এমন নিকষ-কালো অন্ধকার।

পরক্ষণে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে কানে এল এক প্রলয়ের মহা গর্জন। অন্ধকারে সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'বন্যা! বন্যা!'

মরিবাঁচি করে প্রাণের দায়ে সবাই ছুটলো তীরের দিকে। দুষ্টকুমারের আর্তনাদ শোনা গেল—'গেলাম! গেলাম!'

অন্ধকারে আর আতঙ্কে তার দিক ভুল হয়ে গেছে। চীৎকার করে সে ডাকতে লাগলো বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকরদের।

কিন্তু কোথায় কে? ততক্ষণে বন্ধুবান্ধবের দল উধাও। চাকরবাকরও পালিয়েছে। তার জন্যে কে যাবে প্রাণ দিতে? বরং সে মরলে সবার হাড় জুড়োয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্যা এসে আকাশসমান ঢেউয়ের তোড়ে দুষ্টকুমারের আর্তনাদ স্তব্ধ করে দিল।

তীরে দাঁড়িয়ে ছিল বন্ধুবান্ধবের দল। চাকররা ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলে, "রাজকুমার কই?"

চাকররা যেন আকাশ থেকে পড়লো, বললে, "তা তো বলতে পারি নে। আমরা ভাবলাম, রাজকুমারকে নিয়ে আপনারা বুঝি আগেই চলে এসেছেন। হায় হায়! কি হবে এখন?"

বন্ধুরা চুপ। অন্ধকারে নদীর তীরে তীরে তারা খুঁজতে লাগলো রাজকুমারকে, তার নাম ধরে কত ডাকলো। শেষে একজন বললে, "কুমার হয়তো আগেই বাড়ি চলে গেছেন।"

শুকনো মুখে তারা ফিরে এল রাজপুরীতে।

লোকজন নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠায় রাজা সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কই, কুমার কোথায়? তোমরা এলে, সে কোথায়?"

মাথা হেঁট করে বন্ধুরা বললে, "আমরাও তো তাকে খুঁজছি, মহারাজ। নদীতে সে নেই; তাই মনে করলাম, হয়তো আগেই প্রাসাদে ফিরে এসেছে।"

রাজা-রানী অস্থির হয়ে পড়লেন। সেই বিষম দুর্যোগ মাথায় করে লোকলস্কর নিয়ে রাজা ছুটলেন নদীতে। তারপর কত খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি!

রাজপ্রাসাদ কান্নায় ভেঙে পড়লো।

এদিকে হাবুডুবু খেতে খেতে দুষ্টকুমার ভেসে চলেছে। ঢেউয়ের তোড়ে সে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে,—ডুবছে, ভাসছে আর আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করছে—'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কালো কালি দিয়ে কে যেন সব লেপে দিয়েছে—নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ দুষ্টকুমারের হাতে কি যেন ঠেকলো। হাত বুলিয়ে বুঝলে—প্রকাণ্ড এক কাঠের গুঁড়ি।

দুষ্টকুমার প্রাণপণে সেটা জড়িয়ে ধরলো, তারপর সব শক্তি জড়ো করে উঠে বসলো তার মাঝখানে।

গুঁড়ির উপরে কিন্তু আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছিল আরো তিনটি প্রাণী—এক সাপ, এক ইঁদুর আর এক শুকপাখি।

আগের জন্মে সাপ ছিল মহা ধনবান এক বণিক—অফুরন্ত ধন-সম্পদের মালিক। চোরের ভয়ে চল্লিশ কোটি সোনার মোহর সে ওই নদীর ধারে এক জায়গায় পুঁতে রেখেছিল। ধনদৌলতের উপর তার এমনি লোভ ছিল যে, মৃত্যুর পরেও সে মুক্তি পেল না। সাপ হয়ে ওই ধনভাণ্ডারের কাছেই এক গর্তে এসে বাসা নিল।

সাপের মতো ইঁদুরও আগের জন্মে ছিল আর এক বণিক। সে-ও ত্রিশ কোটি সোনার মোহর পুঁতে রেখেছিল ওই নদীর কূলে আর এক জায়গায়। সম্পদের উপর তারও লোভ ছিল অসীম। তাই মৃত্যুর পরে ইঁদুর হয়ে ধনভাণ্ডারের কাছেই এক গর্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

ও দিনের মতো এমন ঝড় বৃষ্টি বন্যা তারা জীবনে দেখে নি। বানের জল গর্তে ঢুকতেই প্রাণের দায়ে তারা বেরিয়ে এল। চারিদিক তখন জলে জলময়। সাঁতার কাটতে কাটতে কাঠের গুঁড়িটা সামনে পেতেই তার উপর তারা চড়ে বসেছিল—সাপ একদিকে, ইঁদুর অন্যদিকে।

শুকপাখি বাস করতো ওই নদীর ধারে এক শিমুল গাছে। ঝড়ে গাছটা উপড়ে পড়তেই শুক উড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ঝড়ে আর বৃষ্টির ঝাপটায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল গুঁড়িটার উপর।

এমনি করে অসহায় চারটি প্রাণী একখণ্ড কাঠ আশ্রয় করে ভেসে চললো। আর অবিরাম চেঁচিয়ে চললো দুষ্টকুমার, 'ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও বাঁচাও! রক্ষা করো!'

যে সময়ের কথা বলছি, তখন বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন নিরাসক্ত—সংসারবিরাগী। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তাঁর মন তো বসলোই না, বরং বৈরাগ্য আরো বেড়ে চললো। শেষে একদিন সবকিছু ত্যাগ করে জীবনে পরম সত্য লাভের আশায় তিনি সন্ন্যাস নিলেন; এবং নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে কুটির বাঁধলেন ওই নদীর বাঁকে এক বনস্থলীতে।

সেদিন নিশীথ রাত্রি, পৃথিবীর বুকে বিষম তাণ্ডব। ঘনঘোর অমানিশার অন্ধকারে আকাশ ও পৃথিবী একাকার। সন্ন্যাসী

বোধিসত্ত্ব কুটিরের সামনে পায়চারি করছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে এল অসহায় মানুষের আর্ত কণ্ঠ, 'ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও বাঁচাও! রক্ষা করো!'

বোধিসত্ত্ব সচকিত হয়ে উঠলেন: বিপন্ন জীব! বন্যাকবলিত বিপন্ন মানুষ ডাকছে!

'ভয় নেই' বলতে বলতে তিনি জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিলেন দুরন্ত বন্যায়।

দেহে তাঁর হাতীর জোর। মনের জোর আরো বেশী। আর্ত জীবকে বাঁচানোর চিন্তায় সে জোর যেন শতগুণ বেড়ে গেল। হিংস্র বন্যা তাঁকে রুখতে পারলো না, দুরন্ত স্রোত হার মানলো তাঁর কাছে। ঢেউয়ের উপর দিয়ে তীরের মতো সাঁতরে গিয়ে তিনি কূলে টেনে আনলেন গুঁড়িটাকে।

দুষ্টকুমারকে কোলে তুলতে গিয়েই তাঁর নজরে পড়লো আরো তিনটি প্রাণী—এক সাপ এক ইঁদুর আর এক শুকপাখি মরার মতো পড়ে আছে গুঁড়ির উপর।

বোধিসত্ত্ব সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কুটিরে ফিরে আগুন জ্বাললেন।

ইতর প্রাণিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর বড় কষ্ট হলো। আহা! স্বল্পপ্রাণ অবোলা জীব! না-জানি কত কষ্ট হচ্ছে—বলতে পারছে না! শীতে এখনি হয়তো মরে যাবে। তাই আগে তিনি ওদের সযত্নে আগুনে সেঁকলেন, সেবাশুশ্রূষা করলেন। তারপর নজর দিলেন দুষ্টকুমারের দিকে। খাওয়ার বেলাতেও সেই ব্যবস্থা—আগে ইতর প্রাণীদের, তারপর দুষ্টকুমারের।

ধীরে ধীরে জন্তুগুলো সুস্থ হয়ে উঠলো। দুষ্টকুমারও সুস্থ হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্বের ব্যবহারে তার সারা অন্তর বিষিয়ে গেছে, নিজের মনে সে ফুঁসছে: কোথাকার এক নগণ্য সন্ন্যাসী! তার এত

স্পর্ধা যে, ইচ্ছে করে তাকে অপমান করে! সে রাজপুত্র—তার সেবা আগে না করে ভিখিরী শয়তানটা পরিচর্যা করছে কিনা ওই ইতর জন্তুগুলোর!

মনে মনে সে স্থির করলে, 'দিন এলে সুদে আসলে এর শোধ তুলবো।'

কয়েক দিন পরে বন্যার জল নেমে যেতে, তারা একে একে এসে বিদায় নিল সন্ন্যাসীর কাছে।

প্রথমে সাপ এসে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে, "বাবা, আপনার জন্যে প্রাণ ফিরে পেয়েছি, একথা চিরকাল মনে থাকবে। এ ঋণ আমি কোন দিনই শোধ করতে পারবো না। তবু বাবা, আমি গরীব নই। আমার গর্তের কাছে মাটির নীচে চল্লিশ কোটি সোনার মোহর পোঁতা আছে, এত দিন আমিই তার মালিক ছিলাম। আজ থেকে সে সবই আপনার। যত শীঘ্র সম্ভব সম্পদের ঐ বোঝা থেকে আমায় আপনি মুক্তি দিন। যখনই ওটা আপনার দরকার হবে, আমার বাসার কাছে গিয়ে একবার শুধু 'দীঘা' বলে ডাকবেন, আমি তখ্‌খুনি বেরিয়ে এসে সমস্ত ধনভাণ্ডার আপনাকে দেখিয়ে দেব। বলুন বাবা, আপনি যাবেন?"

সহাস্যে বোধিসত্ত্ব কথা দিতে সাপ মহানন্দে নিজের বাসার ঠিকানা জানিয়ে বিদায় নিল।

এবার ইঁদুর এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললে, "বাবা, আপনার দয়াতেই মরতে মরতে বেঁচে গেছি। এ উপকার আমি ভুলতে পারবো না। আমিও নিতান্ত নির্ধন নই। আমারও গর্তের কাছে মাটির নীচে তিরিশ কোটি সোনার মোহর পোঁতা আছে। সে ধন আপনাকে দিয়ে আমি মুক্তি পেতে চাই। দরকার হলেই আপনি দয়া করে আমার গর্তের কাছে গিয়ে একবার কেবল 'মূষিক' বলে ডাকবেন, আমি তখ্‌খুনি সমস্ত ধন আপনার হাতে তুলে দেব।"

ইঁদুর চলে যেতেই শুক এগিয়ে এল, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললে, "বাবা, যত দিন বাঁচবো, আপনার দয়া ও মহত্ত্বের কথা ভুলতে পারবো না। কিন্তু বাবা, আমার তো দেবার মতো টাকাপয়সা সোনাদানা নেই! একটা কাজ আমি করতে পারি। আপনার যদি কখনো ভাল ধানের দরকার হয় তো আমি যে গাছে থাকবো, তার কাছে গিয়ে একবার শুধু 'শুক' বলে ডাকবেন—আমি তখ্‌খুনি জ্ঞাতিবন্ধুদের নিয়ে আপনার জন্যে পৃথিবীর সেরা ধান গাড়ি গাড়ি এনে দেব।"

এই বলে নিজের গাছের ঠিকানা দিয়ে শুক চলে যেতেই দুষ্টকুমার এসে প্রণাম করলো। মুখে হাসি টেনে বললে, "প্রভু, আমি বারাণসীর রাজা হলে দয়া করে আমার কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেবেন। সাধ্যমতো উপচারে আপনার পুজো করবো।"

প্রশান্ত হেসে সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন।

তারপর কত দিন কেটে গেছে!

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদত্ত মারা গেছেন। বারাণসীর রাজা হয়েছে দুষ্টকুমার।

প্রায়ই বোধিসত্ত্বের মনে পড়ে দুষ্টকুমার, সাপ, ইঁদুর ও শুকের কথা। শেষে একদিন তিনি স্থির করলেন, 'বন্যার পর বিদায় নেবার সময় ওরা প্রত্যেকেই তো বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে গেছে। এখনো সেসব কথা মনে রেখেছে কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

প্রথমেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন সাপের গর্তের কাছে। ডাকলেন, "দীঘা-আ—"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দীঘা দ্রুত বেরিয়ে এল। বোধিসত্ত্বের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললে, "মনে পড়লো বাবা

এতকাল পরে? আপনার পথ চেয়ে দিন গুণছিলাম। আপনার ধন এবার আপনি গ্রহণ করে ও-দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দিন। ঐ ওখানে রয়েছে সেই চল্লিশ কোটি মোহর—তুলে নিয়ে যান।"

সাপের কথায় বোধিসত্ত্বের মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "বেশ বাবা, বেশ। তোমার কল্যাণ হোক। কিন্তু এখন তো আমার ধনদৌলতে কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

সেখান থেকে তিনি গেলেন ইঁদুরের কাছে। তার গর্তের কাছে গিয়ে 'মূষিক' বলে ডাক দিতেই চোখের নিমেষে ইঁদুর বেরিয়ে এল। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে হাসিমুখে বললে, "এসেছেন বাবা এতকাল পরে অধমকে নিষ্কৃতি দিতে? ওই দেখুন—ওখানে রয়েছে সেই ধনভাণ্ডার, নিয়ে যান দয়া করে।"

সস্নেহ হাসি হেসে বোধিসত্ত্ব বললেন, "থাক বাবা, থাক। তোমার কথা শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্তু ধনভাণ্ডার নেবার জন্যে আমি এখন আসি নি। এসেছি তোমাদের দেখতে। যখন সময় হবে, ও ধন আমি নিয়ে যাব।"

এবার তিনি রওনা হলেন শুকের উদ্দেশে। নির্দিষ্ট গাছতলায় এসে ডাকলেন, 'শু-উ-উ-ক।'

গাছের মাথায় কোন্ পাতাঝোপের আড়ালে শুক বসে ছিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনেই শশব্যস্তে গাছ থেকে নেমে এল। গড় হয়ে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "আপনার পদধূলি পেয়ে ধন্য হলাম বাবা। আদেশ করুন, কি ধান দরকার। যত চাইবেন, আমি তা জ্ঞাতিবন্ধুদের নিয়ে আসমুদ্র-হিমাচল যেখান থেকে হোক অনায়াসে এনে দেব। বলুন বাবা, কি ধান আনবো?"

বোধিসত্ত্বের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। শুককে আশিস জানিয়ে বললেন, "থাক বাবা, এখন দরকার নেই। দরকার হলে তোমায় নিশ্চয়ই বলবো।"

শুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন বারাণসীর দিকে। মুখে তাঁর পরিতৃপ্তির হাসি, মনে অনাবিল শান্তি।

সুন্দর ভুবনের সব কিছু আজ সন্ন্যাসী বোধিসত্ত্বের কাছে বড় আনন্দময় লাগছে। ভাবতে ভাবতে চলেছেন তিনি—'পশুদের মাঝে যখন এত মহত্ত্ব, এমন কৃতজ্ঞতা, তখন রাজার অন্তর না-জানি কত বড়!'

বারাণসীতে যখন তিনি পৌঁছলেন, বিষণ্ণ পৃথিবীর বুকে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠলো। নগরীর ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। তোরণে তোরণে সান্ত্রীর সতর্ক পাহারা।

সন্ন্যাসী রাজোদ্যানে আশ্রয় নিলেন রাত্রির মতো।

পরদিন।

রাজসন্দর্শনে ধীর মন্থর পদে চলেছেন বোধিসত্ত্ব। হাতে তাঁর ভিক্ষাপাত্র, পরনে গৈরিক বসন—সৌম্যশান্ত সন্ন্যাসী পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন।

কিছুদূর যেতেই তাঁর গতিরোধ হলো। রাজপথ কাঁপিয়ে এক শোভাযাত্রা আসছে। রাজপুরুষ সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বারাণসীরাজ দুষ্টকুমার সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে নগর-ভ্রমণে বেরিয়েছে। অঙ্গে তার মণিমুক্তাহীরকখচিত রাজোচিত বেশভূষা। কিন্তু চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার ভ্রূকুটি, অবজ্ঞার হাসি। সন্ত্রস্ত পুরবাসীরা রাজপথ ছেড়ে এদিক ওদিক ছুটছে আশ্রয়ের সন্ধানে। চারিদিকে 'সামাল! সামাল!' চীৎকার।

নীরবে বোধিসত্ত্ব একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

দুষ্টকুমার হঠাৎ চমকে উঠলোঃ পথিপার্শ্বে কে ওই সন্ন্যাসী? এঁ্যা, সেই ভণ্ড শয়তান!

বিজাতীয় রাগে ও ঘৃণায় তার চোখমুখ বীভৎস হয়ে উঠলো। মুখে ফুটে উঠলো কুটিল ক্রূর হাসি—'শয়তান! ভেবেছিস, রাজ-প্রাসাদের আরামে বিলাসে দেহের মেদ বৃদ্ধি করবি! সেদিনের সে অপমানের প্রতিফল আজ তোকে কড়ায় গণ্ডায় পেতে হবে। আমাকে অপমান করার শাস্তি কি, তোকে দিয়েই তা সবাইকে বুঝিয়ে দেব।'

ভয়ঙ্কর কণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠলো, "বন্দী কর্ ওই ভণ্ড তপস্বীকে—ওই যে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে! আমাকে ও এককালে বিষম অপমান করেছিল। বন্দী কর্ ওকে! খবরদার! ও যেন আর এক পা-ও এদিকে না আসে। পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ওকে মশানে নিয়ে যা। যাবার পথে প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে সাধ্যমতো চাবুক মারবি। তারপর মশানে নিয়ে ওর মুণ্ডচ্ছেদ করে ধড়টা শূলে চাপিয়ে দিবি।"

শোভাযাত্রার মাঝে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। মন্ত্রী, কোটাল, সিপাহীসান্ত্রী—সবাই স্তম্ভিত। এ কী সাংঘাতিক নৃশংস আদেশ!

দুষ্টকুমার গর্জন করে উঠলো, "সাবধান! আমার হুকুমের এতটুকু নড়চড় যেন না হয়! তাহলে রক্ষা থাকবে না।"

সবাই শিউরে উঠলো।

বোধিসত্ত্ব নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনভোলা সন্ন্যাসীর খেয়াল নেই কোনদিকে। হয়তো ভাবছিলেন, কিভাবে রাজার দৃষ্টিপথে আসবেন। এমন সময় সিপাহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর, পিঠমোড়া দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললো।

বোধিসত্ত্ব হতভম্বঃ এ কী ব্যাপার!

সিপাহীরা গলায় দড়ি বেঁধে টান মারতেই তাঁর চমক ভাঙলো। ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোথাও কোন গুরুতর ভুল হয়েছে। তাই অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কেন আমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করছো ? তোমরা ভুল করছো। আমি তো কোন অপরাধ করি নি !"

সিপাহীদের সর্দার হাত জোড় করে বললে, "ঠাকুর, আমাদের অপরাধ নেবেন না। আমরা নিরুপায়। ভুল করি নি, রাজাদেশ পালন করছি মাত্র।"

"রাজাদেশ ! কেন ?"

সবিনয়ে সর্দার বললে, "তা জানি নে, প্রভু। তবে শুনলাম, আপনি নাকি আমাদের রাজাকে কবে অপমান করেছিলেন।"

"রাজাকে অপমান করেছিলাম ? আমি ? ভুল !—তোমাদের রাজা নিশ্চয়ই ভুল করছেন।" বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে বিব্রত বোধিসত্ত্ব বললেন।

সর্দার বললে, "তা বলতে পারবো না, ঠাকুর। তবে মনে হয়, মহারাজ ভুল করেন নি, জেনে-শুনেই এ আদেশ দিয়েছেন।"

বোধিসত্ত্ব নির্বাক হয়ে গেলেন। গলার দড়ি ধরে রাজার লোক তাঁকে টেনে নিয়ে চললো হিড়হিড় করে।

বোধিসত্ত্বের চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। তাঁর অন্তর তোলপাড় করছে ঃ এ কী জগতের চেহারা, প্রভু ? পশুর মধ্যে দেবতা, মানুষের মধ্যে শয়তান !

নীরবে চললেন তিনি মাথা হেঁট করে। ধীরে ধীরে মন তাঁর শান্ত হয়ে এল, মুখে আবার ফুটে উঠলো বৈরাগ্যের সেই প্রশান্ত হাসি।

দেখতে দেখতে এ সংবাদ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো নগরময়। বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাজার ভৃত্য যত অগ্রসর হয়, ততই বাড়ে নগরবাসী কৌতূহলী জনতার সংখ্যা। তাদের মধ্যে বিস্ময়ের গুঞ্জন ঃ এমন কি অপরাধ করেছেন সন্ন্যাসী, যেজন্যে এত বড় দণ্ড তাঁকে পেতে হলো ?

প্রথম চৌমাথায় এসে রাজ-অনুচররা বোধিসত্ত্বকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করালে। তারপর শুরু করলে কশাঘাত—অবিশ্রান্ত, বৃষ্টিধারার মতো।

কিন্তু সন্ন্যাসী নির্বাক অচঞ্চল। যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ নেই, মুখে প্রশান্ত মৃদু হাসি।

অভিভূত জনতার মাঝে গুঞ্জন থেমে যায়। অনুচররাও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তারা নিরুপায়। নতুন রাজার আদেশ—ন্যায় হোক অন্যায় হোক নির্বিচারে পালন করতে হবে। অমান্যকারীর শাস্তি কি ভয়ঙ্কর, তারা জানে।

হঠাৎ জনতা সচকিত উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। শুনলো, মধুর কণ্ঠে সন্ন্যাসী আবৃত্তি করছেন ঃ

"অমানিশার অন্ধকার, নদীর বুকে বান,
কাঠের উপর আর্ত মানুষ, দেখে কাঁদে প্রাণ।
লোকে বলে, মানুষ ফেলে কাঠ তুলে নাও ঘরে,
এ যে কত দারুণ সত্য, বুঝছি অনেক পরে।
বাঁচাও যদি মানুষকে, সে মহা শত্রু হবে,
কাঠের গুঁড়ি তুললে ঘরে বহু কাজ পাবে॥"

অদ্ভুত শ্লোক! কী এর অর্থ? নগর-জনতা, রাজার ভৃত্য—সবাই বিস্মিত।

সন্ন্যাসীকে নিয়ে ভৃত্যেরা আবার অগ্রসর হয় মশানের দিকে। আর পিছনে অনুসরণ করে বিশাল জনসমুদ্র। উদ্বেলিত নগর যেন ভেঙে পড়েছে।

একদিকে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ, অপর দিকে সন্ন্যাসীর হাস্যময় প্রশান্ত মুখচ্ছবি, সর্বোপরি তাঁর অপরূপ কণ্ঠের রহস্যময় আবৃত্তি—সব মিলে জনতাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। অনাচারী নিষ্ঠুর নতুন

রাজার কথায় তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। সন্ন্যাসীর পিছনে চলেছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আবার চৌমাথা। অনুচররা আগের মতোই আবার বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করালে। তারপর শুরু হলো আবার সেই নির্মম কশাঘাত।

সন্ন্যাসীর গলায় দড়ির বন্ধন, দুই হাত পিছনে বাঁধা। তাঁর দেহের বসন ছিন্নভিন্ন, মাথার জটাজুট আলুথালু। বুকে পিঠে মাথায় শিলাবৃষ্টির মতো কশাঘাত পড়ছে। সর্বাঙ্গে রক্তের স্রোত বইছে। তবু অবিচল সন্ন্যাসী। চোখে মুখে যন্ত্রণার আভাস পর্যন্ত নেই।

হঠাৎ জনসমুদ্র আবার সচকিত হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসী আবার সেই কবিতা আবৃত্তি করছেন।

বিচলিত জনতা আর যেন সহ্য করতে পারে না। তারা দুলছে, ফুঁসছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। সন্ন্যাসীর আবৃত্তি শেষ হতেই তাদের

ভিতর থেকে কয়েকজন বৃদ্ধ পুরবাসী এগিয়ে এলেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাভাগ, আপনার এই অমানুষিক লাঞ্ছনা আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে বলুন—আমাদের রাজার কাছে এমন কি গুরুতর অপরাধ আপনি করেছিলেন, যার জন্যে এই নিদারুণ শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হচ্ছে। আপনার ওই শ্লোকের মর্মও আমরা বুঝতে পারছি না।"

বোধিসত্ত্ব নিরুত্তর। আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে কি যেন ভাবছেন তিনি। সবিনয়ে পুরবাসীরা আবার অনুরোধ করে, "বলুন প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

তবুও নিরুত্তর বোধিসত্ত্ব। বিপুল জনসমুদ্র তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদেরও চোখেমুখে সেই একই মিনতি, সেই একই জিজ্ঞাসা।

শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্বকে বলতে হলো। শান্ত কণ্ঠে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে শেষে তিনি বললেন, "তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, প্রবাদ বাক্য সে সময় গ্রাহ্য করি নি বলেই কি এই শাস্তি আজ আমায় পেতে হলো?"

নগর-জনতা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল সে-নিষ্ঠুর বিবরণ। সন্ন্যাসী চুপ করতেই সমুদ্রে যেন ঝড় উঠলো। নতুন রাজার কুশাসন ও অত্যাচারে এমনিতেই তাদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল, সন্ন্যাসীর কথায় সেখানে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সর্বশ্রেণীর সেই জনসমুদ্র ক্ষোভে ও আক্রোশে গর্জন করে উঠলো, "নিপাত করো! দুর্জনকে নিপাত করো! ও রাজা থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে।"

বলতে বলতে ছুটলো জনতা। তীর, শক্তি, পাথর, মুদ্গর—যে যা পেল, তাই নিয়ে ছুটলো হাজার হাজার মানুষ। রাজার সিপাহী-সান্ত্রী সভাসদ্—কোথায় কে ছিটকে পড়লো প্রাণের দায়ে! দুষ্টকুমার একা। প্রাণ দিল জনতার হাতে।

বোধিসত্ত্ব তখন বিচিত্র জীবন-রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে বারাণসী ছেড়ে ফিরে চলেছেন বনস্থলীর কুটিরে—আপন সাধনক্ষেত্রে। নগরীর সিংহদ্বারের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় তাঁর কানে এল জনতার বিপুল জয়ধ্বনি। দেখতে দেখতে পুরবাসী জনতা আবার এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো, সবিনয়ে প্রার্থনা জানালে, "প্রভু, রাজাহীন রাজ্য চলে না, তাই বারাণসীর রাজমুকুট আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।"

বোধিসত্ত্ব যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সে কি! বিব্রত কণ্ঠে বললেন, "না, না, এ কী বলছো তোমরা? এ হতে পারে না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আমি। রাজসিকতায় আমার মোহ নেই, রাজপাটেও লোভ নেই। রাজ্যশাসনের সময়ই বা কই আমার? তাছাড়া এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও নেই কিছু। তোমরা অন্য কাউকে নির্বাচন করো।"

কিন্তু জনতা তাঁর কোন যুক্তিতর্কই শুনলো না, নগর-প্রধানেরা তাঁর পদতলে বসে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত নাগরিকদেরই জয় হলো। বোধিসত্ত্ব গ্রহণ করলেন বারাণসীর রাজপাট।

সিংহাসনে বসে তাঁর মনে পড়লো সাপ, ইঁদুর ও শুকের কথা। নিজে গিয়ে তাদের তিনি নিয়ে এলেন, আর নিয়ে এলেন সেই বিপুল ধনভাণ্ডার। সাপের বসবাসের জন্যে তিনি তৈরি করিয়ে দিলেন এক সোনার নল, ইঁদুরের জন্যে এক স্ফটিক-গুহা আর শুকের জন্যে এক সোনার খাঁচা।

তার পর?

তার পর থেকে রাজ্যময় শুধু হাসি আনন্দ উৎসব।

# পরিণাম ও পুরস্কার

রাজার একশো ছেলে। তাঁদের মধ্যে বোধিসত্ত্ব ছিলেন সকলের ছোট। কিন্তু বয়সে ছোট হলে কি হয়, বিদ্যাবুদ্ধি আর চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন সকলের বড়।

রাজবাড়িতে সাধুসন্ন্যাসীদের অবারিত দ্বার—সত্যিকারের যাঁরা জ্ঞানী-গুণী সাধু ও সজ্জন, তাঁদের জন্যে রাজভবনে ছিল আহারাদির রাজসিক ব্যবস্থা। আর এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব। এ দায়িত্ব তাঁর উপর কেউ চাপিয়ে দেয় নি, তিনি স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিচালনার গুণে সাধুসন্ন্যাসীদের কোন অসুবিধা ছিল না, তাঁদের

পরিচর্যা ও আদর-আপ্যায়নে এতটুকু ত্রুটি ঘটতো না। ফলে, বোধিসত্ত্বকে তাঁরা প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

বেশ শান্তিতেই বোধিসত্ত্বের দিন কাটছিল—কোন অভাব ছিল না, মনে কোন অতৃপ্তি বা অভাব-বোধও ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন থেকে কি হয়েছে, বোধিসত্ত্ব নিজেই বুঝে পান না—মাঝে মাঝে ছোট্ট এক টুকরো চিন্তা এসে তাঁকে আনমনা করে তোলে, ভবিষ্যতের এক অন্ধকার ছবি মনের মাঝে বারে বারে উঁকিঝুঁকি মারে, কে যেন অন্তর থেকে বলে—বোধিসত্ত্ব! তুমি রাজকুমার হলে কি হবে, বড় ভাইয়েরা থাকতে এখানকার রাজপাট তোমার কপালে জুটবে না। ভেবে দেখ, বোধিসত্ত্ব!

কি ভাববেন বোধিসত্ত্ব? এ তো তাঁর অজানা নয়! তাই তিনি ছটফট করতে থাকেন এ দুষ্ট চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে। কিন্তু যত দিন যায়, ততই মনের দিগন্তে ছোট এক খণ্ড কালো মেঘ একটু একটু করে ডানা মেলতে থাকে। পরিণাম ভেবে বোধিসত্ত্ব শিউরে ওঠেন।

শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন তিনি ঠিক করলেন—'সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে আমার জীবনের পথরেখা। এভাবে চললে কারো মঙ্গল নেই।'

সেদিন আহারাদির পর সন্ন্যাসীরা বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় বোধিসত্ত্ব গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে একপাশে বসলেন, একথা-সেকথার পর সলজ্জ কণ্ঠে ধীরে ধীরে খুলে বললেন তাঁর গোপন চিন্তার কথা, শেষে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, এ পাপ চিন্তার হাত থেকে কি আমার নিস্তার নেই? অন্যায়ভাবে কোন রাজপাট আমি চাই না। দয়া করে বলুন, আমার ভাগ্যে কি রাজ্যলাভ আছে?"

সন্ন্যাসীরা নির্নিমেষ চোখে বোধিসত্ত্বের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কি দেখলেন কে জানে! শেষে একজন বললেন, "আছে,

কিন্তু এ নগরে নয়। এ রাজ্যের সিংহাসন তুমি পাবে না। এখান থেকে দুই হাজার যোজন দূরে গান্ধার দেশ, সেখানে তক্ষশিলা নামে এক নগরী আছে। তক্ষশিলায় যদি যেতে পার, তাহলে আজ থেকে সাত দিনের দিন সেখানকার রাজ্য পাবে তুমি। কিন্তু—"

সন্ন্যাসী থেমে যেতেই বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কি, প্রভু? দয়া করে সব খুলে বলুন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "তক্ষশিলায় যাবার দুটো পথ আছে: একটা সোজা পথ, অন্যটা ঘুরপথ। সোজা পথে গেলে পথে পড়ে এক মহা বন। গহন গভীর সে মহারণ্যে নানা রকম ভয়ঙ্কর বিপদ-আপদের ভয় আছে। বনপথ ছেড়ে অবশ্য ঘুরপথেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে একশো যোজন পথ বেশি পড়ে। সে পথে গেলে সাত দিনের মধ্যে তক্ষশিলায় তুমি পৌঁছতে পারবে না।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, "সে মহারণ্যে কিসের ভয়, প্রভু?"

"যক্ষের। নরমাংসাশী মায়াবী যক্ষেরা সেখানে বাস করে। কোন পথিক আসছে দেখলে, যক্ষিণীরা মায়াবলে পথের দুধারে মাঝে মাঝে পান্থশালা তৈরি করে রাখে—পান্থশালা তো নয়, যেন মণিমুক্তাখচিত অপরূপ সব রাজপুরী। পুরীর ঘরে ঘরে স্বর্ণতারকাখচিত ঝলমলে চন্দ্রাতপ শোভা পায়, চন্দ্রাতপের নীচে থাকে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিছানো। আর যক্ষিণীরা মোহিনী রূপ ধরে পুরীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'পথিক, তুমি কি খুব ক্লান্ত পিপাসার্ত হয়েছ? তা, অত কষ্ট করবার কি দরকার? এসো বন্ধু, ঘরে এসে একটু বসে যাও। বিশ্রাম করে আবার পথ চলো।' তাদের সেই মোহিনী রূপ আর মধু-কণ্ঠের আহ্বান এড়ানো বড় কঠিন। সব কিছু ভুলে হিতাহিত-জ্ঞানহারা মুগ্ধ পথিক তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। তারপরে যা ঘটে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যক্ষিণীরা তাকে খেয়ে ফেলে।"

সাগ্রহে বোধিসত্ত্ব বললেন, "কিন্তু তাদের মায়ায় যদি আমি না ভুলি—"

বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "যক্ষিণীদের আরো একটা ক্ষমতা আছে। যে লোক যা ভালবাসে, তারা তাই সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় মায়াবলে বশীভূত করার ক্ষমতা আছে তাদের। কেউ হয়তো রূপের কাঙাল—রূপ ভালবাসে, যক্ষিণীরা তাকে রূপের ছটায় মোহিত করে। আবার কেউ হয়তো তত রূপের পাগল নয়, সঙ্গীত খুব ভালবাসে, যক্ষিণীরা তাকে অনবদ্য সঙ্গীতের মূর্ছনায় বশীভূত করে। এমনি করে যে ভোজনবিলাসী তাকে অমৃতের মতো খাদ্য দিয়ে, যে শয্যাবিলাসী তাকে দেবদুর্লভ শয্যা দিয়ে, যে গন্ধবিলাসী তাকে অলৌকিক সুগন্ধ দিয়ে তারা মোহিত করে।"

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললেন, "সুতরাং বাবা, বুঝতে পারছ, বিপদ কত গুরুতর। তবে মনকে বশে রাখার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, আর যদি সঙ্কল্প করো যে, কিছুতেই ওদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাবে না, তাহলে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নেই, সাত দিনের দিন তক্ষশিলার সিংহাসন নিশ্চয়ই তুমি লাভ করবে। মনে রেখো, কেউ যদি নিজে থেকে ধরা না দেয়, তাহলে যক্ষিণীরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না।"

সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়ালেন, যুক্তকরে বললেন, "প্রভু, আশীর্বাদ করুন, সমস্ত বিপদ পার হয়ে নির্বিঘ্নে যেন তক্ষশিলায় পৌঁছতে পারি। যে উপদেশ আপনারা দিলেন, তারপরে সহস্র যক্ষিণীর সহস্র ছলচাতুরীও আমাকে আর প্রলুব্ধ করতে পারবে না।"

সেখান থেকে তিনি বাবা-মা ও দাদাদের কাছে গিয়ে সব কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন নিজের অনুচরদের। তাদের কাছেও তিনি কোন কথা গোপন না

করে শেষে বললেন, "সুতরাং আমি একাই যাব তক্ষশিলায়, তোমরা এখানে থাকবে। রাজ্য পেলে তোমাদের নিয়ে যাব।"

সবাই রাজী হলো বটে, কিন্তু পাঁচজন ঘনিষ্ঠ সহচর কিছুতেই শুনলে না ; বললে, "আমরা যাব আপনার সঙ্গে।"

বোধিসত্ত্ব তাদের কত বুঝালেন, কত বিপদ-আপদের ভয় দেখালেন, কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা ; বললে "আমাদেরও তো প্রাণের মায়া আছে। যক্ষিণীদের বশীভূত হলে মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন কেন সে কাজ করবো ? স্বেচ্ছায় অকারণে কেউ কি মরতে চায় ?"

শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্বকে রাজী হতে হলো ; বললেন, "বেশ, তাই হোক। কিন্তু সব সময় খুব সতর্ক থেকো, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না যক্ষিণীদের কথা। কোন বিপদ ঘটিও না কিন্তু।"

তাঁরা রওনা হলেন।

দিনে রাতে তাঁদের বিশ্রাম অতি সামান্য। পাঁচ দিনের দিন শেষ রাতে দেখা গেল সেই মহারণ্য।

সত্যিই ভয়াবহ সে মহা বন! নিস্তব্ধ গম্ভীর। যুগযুগান্তের বনস্পতির দল গায়ে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লতায় পাতায় দুর্ভেদ্য সে মহারণ্যের দিকে তাকালে আতঙ্কে বুক কাঁপে। দিনের বেলায়ও সেখানে গোধূলির অন্ধকার।

অনুচরদের বারবার সতর্ক করে বোধিসত্ত্ব বনে ঢুকলেন। কিছুদূর যেতেই সচকিত হয়ে উঠলেন তাঁরা। দেখেন—পথের পাশে অপরূপ সব রাজপুরী, যেন স্বর্গের সুষমা দিয়ে তৈরী। পুরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অপ্সরার মতো রূপসী নারীর দল। মধুঢালা কণ্ঠে তারা ওঁদের ডাকছে—সন্ন্যাসীরা ঠিক যেমনটি বলেছিলেন।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বোধিসত্ত্ব ত্বরিত পদে হাঁটছিলেন, হঠাৎ পিছনে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন ঃ অনুচরদের একজন

অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন, "কি হলো হে দেবদত্ত, পিছিয়ে পড়ছো কেন? তাড়াতাড়ি এসো।"

দূর থেকে লোকটি উত্তর দিল, "পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, কুমার। আপনারা এগোন। পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নিয়েই আমি আসছি।"

সর্বনাশ! বোধিসত্ত্ব চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, কখ্‌খনো যেও না পান্থশালায়। শোন, শোন, একবার শোন আমার কথা। মনে করে দেখো, কি বলেছিলাম। ওরা যক্ষিণী, ওদের রূপে মুগ্ধ হয়ো না। পান্থশালায় ঢুকলে তোমার রক্ষা থাকবে না।"

কিন্তু বৃথাই আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব। লোকটা ততক্ষণে পান্থশালার দিকে পা বাড়িয়েছে—যক্ষিণীরা তাকে বারবার ডাকছে সুধাকণ্ঠে। সে বললে, "যা-ই বলুন না কুমার, আমি আর হাঁটতে পারছি না।" বলতে বলতে পান্থশালার ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অশ্রুভারাক্রান্ত মনে বোধিসত্ত্ব এগিয়ে চললেন বাকি অনুচরদের নিয়ে। লোকটির কপালে যা ঘটবার তাই ঘটলো। কাজ শেষ করে যক্ষিণীরা আবার ছুটলো সামনের দিকে।

কিছুদূর যেতেই বোধিসত্ত্বের কানে এল এক মধুর সঙ্গীত। দেখেন, সামনে আবার এক পান্থশালা!

পান্থশালার ঘরে ঘরে অপরূপ সঙ্গীতের ঝঙ্কার—বনময় তা ছড়িয়ে পড়ছে। সারা বন যেন জীবন্ত বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে। সুরের মূর্ছনায় অদ্ভুত কী এক মাদকতা—মন যেন আবেশে ঝিমিয়ে আসে!

কানে আঙুল দিয়ে বোধিসত্ত্ব ছুটতে থাকেন আর বারবার তাকান পিছনের দিকে। হঠাৎ এক সময় আড়ষ্টের মতো তিনি থেমে গেলেন: আবার একজন অনুচর পিছিয়ে পড়ছে!

হায় হায়! আর রক্ষা নেই! বোধিসত্ত্ব চীৎকার করে উঠলেন, অনুচরটিকে ডাকতে লাগলেন বারবার, কত চেষ্টা করলেন তাকে

নিরস্ত করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! তারও পরিণতি ঘটলো প্রথম জনের মতো।

এমনি করে বোধিসত্ত্বের অন্য তিনজন অনুচরেরও জীবনের পরিসমাপ্তি হলো প্রথম দুইজনের মতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল গন্ধবিলাসী, একজন ভোজনবিলাসী, বাকিজন শয্যাবিলাসী।

বোধিসত্ত্ব এখন একা—প্রিয় অনুচরদের শোকে মন অভিভূত। অশ্রুসজল চোখে তিনি পথ চললেন।

যক্ষিণীদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই বুঝেছিল, এ লোককে বশীভূত করা তাদের সাধ্যের বাইরে। তারা নিরস্ত হলো। ওই একজনই কেবল বোধিসত্ত্বের পিছু লেগে রইল। মনে মনে সে বললে, "যত চরিত্রবানই তুমি হও না কেন, যত মনের জোরই তোমার থাক, তোমাকে শেষ না করে আমি ফিরছি না।"

বন ক্রমেই পাতলা হয়ে আসে। পথের পাশে কাজ করছিল কয়েকজন বনরক্ষক। অবাক হয়ে তারা দেখলে, অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী চলেছে, আর তাকে পিছনে ফেলে অনেক আগে ছুটে চলেছে এক সুন্দর যুবা। তরুণীকে তারা জিজ্ঞেস করলে, "ভদ্রে, আপনার আগে আগে ঐ যে ব্যক্তিটি দ্রুতপদে চলেছেন, উনি আপনার কি হন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তরুণী বললে, "স্বামী।"

স্বামী! বনচরেরা এবার রুখে উঠলো বোধিসত্ত্বের উপর, "ও মশাই, শুনুন তো একটু! আপনাকে দেখে তো সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক বলে মনে হচ্ছে, অথচ এ কী রকম আক্কেল আপনার? এমন স্ত্রী, যার রূপে বন আলো, তাঁকে পিছনে ফেলে আপনি কিনা ছুটছেন এভাবে! আপনার জন্যে উনি সব কিছু ত্যাগ করে এসেছেন, পথের কষ্টও গ্রাহ্য করেন নি, আর তার প্রতিদানে উনি যাতে একটু

স্বচ্ছন্দে ধীরেসুস্থে চলতে পারেন, সেদিকেও আপনার একটু খেয়াল নেই ? আশ্চর্য !"

আরও জোরে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মিথ্যে কথা। ও আমার স্ত্রী নয়—যক্ষিণী। ওরা আমার পাঁচজন সঙ্গীকে খেয়েছে, এখন আমাকে খাওয়ার জন্যে পিছু নিয়েছে।"

যক্ষিণী কেঁদে উঠলো। কপাল চাপড়ে বললে, "হায় হায়! এই কি পুরুষ জাতের ব্যবহার ? রাগ হলে নিজের স্ত্রীর নামেও কলঙ্ক রটাতে লজ্জা পায় না !"

হতভম্ব বনচরেরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বন শেষ হয়ে আসছিল। যক্ষিণী দেখে, কাছে-পিঠে কোন লোকজন নজরে পড়ে না। চোখের নিমেষে তার কোলে এসে হাজির হলো এক দুগ্ধপোষ্য শিশু—দেখলে মনে হয়, এই মাত্র জন্মেছে। শিশুর কান্নায় বনস্থলী সচকিত হয়ে উঠলো।

চলতে চলতে দু-চার জন পথিকের সঙ্গে বোধিসত্ত্বের দেখা হয়। তারাও সচকিত হয়ে ওঠে। বনরক্ষকদের মতো তারাও রুষ্ট হয় বোধিসত্ত্বের উপর। আগের মতোই বোধিসত্ত্ব তাদের কথার জবাব দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যক্ষিণী চোখের জল ছেড়ে দেয়, বুক চাপড়ে বলে, "হায় হায় ! আমার মতো অভাগিনী আর কে আছে ! এমন লোকের সঙ্গে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলেন, যে নিজের ছেলের দিকে তাকায় না, স্ত্রীর নামে কুৎসা রটাতেও যার লজ্জা নেই !"

পথিকের দল বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরে দেখা যায় তক্ষশিলা। যক্ষিণী দেখে, তার ছলচাতুরী সবই ব্যর্থ হলো। চোখের পলকে কোথায় মিলিয়ে গেল তার কোলের ছেলে। আগের মতোই একলা আবার সে অনুসরণ করে চললো বোধিসত্ত্বকে।

তক্ষশিলা নগরীর সিংহদ্বারের কাছে এক পান্থশালায় বোধিসত্ত্ব আশ্রয় নিলেন। যক্ষিণী খুব খুশী। যাক! এইবার সে লোকটাকে কাছে পাবে; তারপর সুযোগ বুঝে রাতেই শেষ করবে তাকে।

ভাবতে ভাবতে যক্ষিণী যেমন ভিতরে ঢুকতে যাবে, অমনি ছিটকে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তার উপরে। কোথায় মিলিয়ে গেল তার হাসি-হাসি ভাব! এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। বুঝলো, লোকটার কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা, তার চরিত্রের জোরে পান্থশালায় ঢোকারও তার সাধ্য নেই।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মুখ কালো করে সে গিয়ে বসলো পান্থশালার দুয়ারে। আর গালে হাত দিয়ে বসে নিজের মনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলো মাকড়সার মতো।

তখন অপরাহ্নবেলা। সূর্যদেব বিদায় নেবার আগে তাঁর সোনালী তুলির স্পর্শে সব কিছু রাঙিয়ে দিচ্ছেন শেষবারের মতো।

তক্ষশিলার রাজা হাতীর পিঠে চলেছেন রাজোদ্যানে—সঙ্গে লোকজন। তাঁরও মনে হয়তো লেগেছিল সেই তুলির স্পর্শ। পান্থশালার দুয়ারে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন: কে ও? কে ওই অনিন্দ্যসুন্দরী নারী? মানুষীর এত রূপ হয় কখনো? না, মানবীর রূপ ধরে স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে পৃথিবীতে?

রাজা মুগ্ধ অভিভূত—চোখ ফেরাতে পারেন না।

পাশের একজন অনুচরকে তিনি হুকুম দিলেন, "যাও তো তাড়াতাড়ি, গিয়ে ওই রমণীকে জিজ্ঞেস করে এসো—ওর স্বামী আছে কিনা, আর থাকলে কোথায় আছে।"

অনুচর গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই যক্ষিণী ঘরের ভিতরে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়ে বললে, "ওই যে, উনি আমার স্বামী।"

ভিতর থেকে বোধিসত্ত্ব প্রতিবাদ করলেন, "কখ্খনো না। ও আমার স্ত্রী নয়, মানুষীও নয়—ও যক্ষিণী। আমার পাঁচজন সঙ্গীকে ওরা খেয়েছে, এখন আমাকে খাওয়ার জন্যে পিছু নিয়েছে।"

বোধিসত্ত্বের কথা শেষ না হতেই যক্ষিণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হায় হায়! আমি এমনি অভাগী যে, দেবতার মতো স্বামী আমার, কোথায় আমাকে রক্ষা করবেন, তা নয় উলটে কিনা যা মুখে আসছে, তাই বলছেন। এত বড় কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমি কোথায় যাবো? হায় হায়, আমার কি হবে গো—"

যক্ষিণীর সে কান্না যে শুনলো, সে-ই বিচলিত হলো। বোধিসত্ত্বের প্রতি ধিক্কারে পান্থশালা মুখর হয়ে উঠলো। মুখে মুখে সে ঘটনা ছড়িয়ে পড়লো নগরময়। নগরের ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে, সর্বত্র চললো বোধিসত্ত্বের নিন্দামন্দ আর তীক্ষ্ণ সমালোচনা।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব অবিচল, যদিও অন্তর ক্ষুব্ধ কিছুটা; কারণ এরকম বিড়ম্বনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এত দুঃখকষ্টের পরে এ কি কলঙ্ক-অপমানের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপলো?

এদিকে রাজা কিন্তু অনুচরের মুখে সব শুনে আনন্দে আত্মহারা। মেয়েটির স্বামী একটি উন্মাদ অপদার্থ—এ কি তাঁর পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা! তাড়াতাড়ি হাতী থেকে নেমে তিনি যক্ষিণীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ভদ্রে, কেঁদো না। এসো আমার সঙ্গে। আমার প্রধানা মহিষী হবে তুমি—পরম আদরে তোমায় মাথায় করে রাখবো। অমন মূর্খ অসৎ লোকের সঙ্গে ঘুরে কি লাভ?"

চোখের জল মুছতে মুছতে যক্ষিণী রাজহস্তীর পিঠে রাজার পাশে গিয়ে বসলো। লাঞ্ছিত বোধিসত্ত্ব নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

রাত্রিবেলা। প্রাসাদের সিংহদ্বারে সান্ত্রী জাগছে, দ্বারে দ্বারে জাগছে প্রহরী। রাজার শয়নাগারে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে যক্ষিণী। এমন সময় চঞ্চল পদে রাজা ঘরে ঢুকলেন।

রাজাকে দেখেই যক্ষিণী পাশ ফিরে শুলো। পরক্ষণেই রাজার কানে এল তার কান্না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। রাজা হকচকিয়ে গেলেন: কি ব্যাপার! হলো কি?

তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন—কি করবেন, ভেবে পান না। কান্নার হেতু জানবার জন্যে যত তিনি নতুন মহিষীর হাতে পায়ে ধরেন, অনুনয়-বিনয় করেন, ততই কান্না তার বেড়ে যায়। শেষে অনেক

সাধ্য-সাধনার পর সে বললে, "মহারাজ, আপনার আরো অনেক মহিষী আছে। একসঙ্গে থাকতে গেলে তাদের সঙ্গে আমার যে সময় সময় কিছু কথা কাটাকাটি তর্কাতর্কি হবে না, এমন নয়। সে সময় তারা রেগে গিয়ে যদি বলে, 'তোকে তো রাজা পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন; তোর বাবা-মা জ্ঞাতি-গোত্রের খবর কেউ জানে না— তুই অজ্ঞাতকুলশীলা', তখন আমি কি করবো? লজ্জা রাখবার আমার যে ঠাঁই থাকবে না, মহারাজ!"

রাজা বসেছিলেন, উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন; বললেন, "বটে! এত বড় স্পর্ধা! কালই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি, যে তোমাকে এসব কথা বলবে, তার গর্দান যাবে।"

শুকনো হাসি হেসে যক্ষিণী বললে, "তা হয় না, মহারাজ। সবচেয়ে ভাল হয়, রাজ্যের সব ক্ষমতা যদি আমার হাতে তুলে দেন। সবার উপরে যদি আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হই, এমন কথা কেউ মুখেও আনতে সাহস করবে না।"

ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ কণ্ঠে রাজা বললেন, "তা তো হয় না, মহিষী! তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই; কিন্তু তুমি হয়তো জানো না, রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর আমার অধিকার নেই। একমাত্র যারা রাজদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী, তাদেরই শুধু আমি শাস্তি দিতে পারি। আমি রাজা বটে, কিন্তু প্রজাদের মতামতের উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়।"

দরদমাখা কণ্ঠে যক্ষিণী বললে, "আহা! তা তো জানতাম না! বেশ, তাই যদি হয়, রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর উপরে প্রভুত্ব যদি না দিতে পারেন, তাহলে রাজ-অন্তঃপুরের উপর, প্রাসাদের সবার উপর আমায় কর্তৃত্ব দিন, তাহলে ওদের অন্ততঃ আমি বশে রাখতে পারবো।"

রাজা তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যক্ষিণীর মোহিনী রূপে তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তাই সোৎসাহে বললেন, "বেশ বেশ, তাই হোক। প্রাসাদের সকলের উপরে তোমায় আধিপত্য দিলাম।"

'বড় খুশী হলাম' বলে যক্ষিণী হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজার বুকও যেন কেঁপে উঠলো কি এক অজানা শঙ্কায়।

নিষুতি গভীর রাত। পৃথিবী অন্ধকার। সুপ্তিমগ্ন রাজপুরী, সুপ্ত নগরী তক্ষশিলা। প্রাসাদের সিংহদ্বারে সান্ত্রী ঘুমায়, দ্বারে দ্বারে প্রহরী অচেতন। প্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ যেন কালঘুম নেমেছে।

নিকষকালো অন্ধকারের স্রোত যেন পাক খেয়ে ফিরছে প্রাসাদ জুড়ে। এমন সময়—ও কী! অন্ধকারের মতো কালো ভীষণদর্শন কারা দলে দলে এগিয়ে এল প্রাসাদের সিংহদ্বারে! সবার আগে আগে প্রাসাদে ঢুকলো সেই যক্ষিণী—এখন সে বিকটদশনা ভয়ঙ্করী। বিকট হেসে সে গিয়ে ধরলো রাজাকে।

তারপর!—

মানুষ তো দূরের কথা, প্রাসাদের একটা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত নিস্তার পেল না যক্ষ-যক্ষিণীদের কবল থেকে। সব শেষ করে যেমন নিঃশব্দে তারা এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে শেষরাতে আবার ফিরে গেল নিজ রাজ্যে, সেই মহারণ্যে।

পরদিন। কালরাত্রির অবসানে উষার আলোয় পৃথিবী জেগে উঠলো। কিন্তু রাজভবন জাগলো না। বেলা বাড়লো। রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ তবু। তক্ষশিলা বিস্মিত। কি হলো? সিংহদ্বারে কেন উষার আগমনী গান নেই, পুরোহিতের মাঙ্গলিক পাঠ নেই, সান্ত্রীদের হাঁকই বা বন্ধ কেন? এ কী অঘটন!

মন্ত্রী এলেন, কোটাল এলেন, সেনাধ্যক্ষ এলেন, সভাসদ্‌রাও এলেন, এলেন জ্ঞানী-গুণী বয়োবৃদ্ধ সব পুরবাসী। তক্ষশিলা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রাসাদের সিংহদ্বারে। তারপর কত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি! কিন্তু নিস্তব্ধ রাজপুরী—মৃতের মতো নিষ্প্রাণ।

## পরিণাম ও পুরস্কার

শেষে নিরুপায় হয়ে নাগরিকেরা খন্তা, কুড়ুল এনে ভেঙে ফেললো সিংহদ্বার। ভিতরে পা দিতেই সবাই আতঙ্কে যেন পাথর হয়ে গেল। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। চারিদিকে হাড়গোড় ছড়ানো, জমাট রক্ত চাপ বেঁধে আছে এখানে-ওখানে। রাজা-রানী, লোকজন তো দূরের কথা, একটা প্রাণীও কোথাও নজরে পড়ে না। রাজপুরী মহাশ্মশান।

সবাই হাহাকার করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "পান্থশালার সেই আগন্তুক বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি মানুষী নয়—যক্ষিণী। তাঁর কথা যে কত সত্য, তা রাজপুরীর বাসিন্দারা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল। যক্ষিণীর রূপে ও মধুমাখা কথায় রাজার মতো আমরাও এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আগন্তুকের কথায় কেউ কান দেই নি, রাজাও দেন নি। উলটে তাঁকে ধিক্কার-বিদ্রূপে জর্জরিত করেছি। যক্ষিণীকে রাজা পাটরানী করেছিলেন। সে নিশ্চয়ই অন্য যক্ষ-যক্ষিণীদের এনে রাতারাতি সবাইকে উদরস্থ করে চলে গেছে।"

নীরবে সবাই সায় দিল মন্ত্রীর কথায়। কিন্তু এখন কি করা? এভাবে বসে শোক করলে তো কেউ আর ফিরে আসবে না!

রাজভবন তারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো। ঘরদোর নতুন করে সাজালো। সুগন্ধ লেপে দিল সর্বত্র। ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে, ফুলের সাজ পরে রাজপুরী আবার হেসে উঠলো।

সবই হলো বটে, কিন্তু রাজা কই? রাজা বিনা তো রাজ্য চলে না! কে রাজা হবে?

সভা বসলো নাগরিকদের। চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধ মন্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার মতে পান্থশালার সেই আগন্তুকই তক্ষশিলার রাজা হবার যোগ্য। তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবান পুরুষ আর কে আছে? অপ্সরার চেয়েও রূপসী নারী পিছনে পিছনে

আসা সত্ত্বেও যিনি একবার তার দিকে ফিরেও তাকান নি, শত প্রলোভন-অপমানেও যিনি অবিচল থেকেছেন, তিনি শুধু জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবানই নন; আমার ধারণা, জ্ঞানে কর্মে ও মহত্ত্বেও তিনি সিংহাসনের যোগ্যতম অধিকারী।”

মন্ত্রীর কথায় সবাই জয়ধ্বনি করে উঠলো, কারণ তাদেরই অন্তরের কথার তিনি প্রতিধ্বনি করেছেন।

পান্থশালার ঘরে বোধিসত্ত্ব তখন নীরবে নতমুখে বসে আছেন, পাশে কোষমুক্ত তরবারি। রাজপুরীর ভয়াবহ ঘটনা তিনিও শুনেছেন। মন তাঁর বিক্ষুব্ধ: হায়! কেউ শুনলো না তাঁর কথা! কেউ কান দিল না তাঁর সাবধান-বাণীতে! তাহলে তো এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই ঘটতো না!

বসে বসে এইসব ভাবছেন বোধিসত্ত্ব, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি।

অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, কাতারে কাতারে তক্ষশিলার মানুষ আসছে পান্থশালার দিকে। সঙ্গীতবাদ্যমুখর বিশাল শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসছে সুসজ্জিত রাজহস্তী। রাজহস্তীর পিছনে আসছেন রাজমন্ত্রী, কোটাল, সেনাধ্যক্ষ, সভাসদ্‌বর্গ, সৈন্যসামন্ত আর তক্ষশিলার বৃদ্ধ নাগরিকের দল।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর কথাই সত্য হলো। নগরময় অপরূপ সাজসজ্জা, নাচগান আর আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। সাত দিন সাত রাত্রি উৎসব-আনন্দে ডুবে রইল তক্ষশিলা।

## পরিণাম ও পুরস্কার

শেষে নিরুপায় হয়ে নাগরিকেরা খন্তা, কুড়ুল এনে ভেঙে ফেললো সিংহদ্বার। ভিতরে পা দিতেই সবাই আতঙ্কে যেন পাথর হয়ে গেল। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। চারিদিকে হাড়গোড় ছড়ানো, জমাট রক্ত চাপ বেঁধে আছে এখানে-ওখানে। রাজা-রানী, লোকজন তো দূরের কথা, একটা প্রাণীও কোথাও নজরে পড়ে না। রাজপুরী মহাশ্মশান।

সবাই হাহাকার করে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন, "পান্থশালার সেই আগন্তুক বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি মানুষী নয়—যক্ষিণী। তাঁর কথা যে কত সত্য, তা রাজপুরীর বাসিন্দারা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল। যক্ষিণীর রূপে ও মধুমাখা কথায় রাজার মতো আমরাও এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, আগন্তুকের কথায় কেউ কান দেই নি, রাজাও দেন নি। উলটে তাঁকে ধিক্কার-বিদ্রূপে জর্জরিত করেছি। যক্ষিণীকে রাজা পাটরানী করেছিলেন। সে নিশ্চয়ই অন্য যক্ষ-যক্ষিণীদের এনে রাতারাতি সবাইকে উদরস্থ করে চলে গেছে।"

নীরবে সবাই সায় দিল মন্ত্রীর কথায়। কিন্তু এখন কি করা? এভাবে বসে শোক করলে তো কেউ আর ফিরে আসবে না!

রাজভবন তারা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো। ঘরদোর নতুন করে সাজালো। সুগন্ধ লেপে দিল সর্বত্র। ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে, ফুলের সাজ পরে রাজপুরী আবার হেসে উঠলো।

সবই হলো বটে, কিন্তু রাজা কই? রাজা বিনা তো রাজ্য চলে না! কে রাজা হবে?

সভা বসলো নাগরিকদের। চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধ মন্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার মতে পান্থশালার সেই আগন্তুকই তক্ষশিলার রাজা হবার যোগ্য। তাঁর মতো জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবান পুরুষ আর কে আছে? অপ্সরার চেয়েও রূপসী নারী পিছনে পিছনে

আসা সত্ত্বেও যিনি একবার তার দিকে ফিরেও তাকান নি, শত প্রলোভন-অপমানেও যিনি অবিচল থেকেছেন, তিনি শুধু জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবানই নন; আমার ধারণা, জ্ঞানে কর্মে ও মহত্ত্বেও তিনি সিংহাসনের যোগ্যতম অধিকারী।”

মন্ত্রীর কথায় সবাই জয়ধ্বনি করে উঠলো, কারণ তাদেরই অন্তরের কথার তিনি প্রতিধ্বনি করেছেন।

পান্থশালার ঘরে বোধিসত্ত্ব তখন নীরবে নতমুখে বসে আছেন, পাশে কোষমুক্ত তরবারি। রাজপুরীর ভয়াবহ ঘটনা তিনিও শুনেছেন। মন তাঁর বিক্ষুব্ধ: হায়! কেউ শুনলো না তাঁর কথা! কেউ কান দিল না তাঁর সাবধান-বাণীতে! তাহলে তো এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই ঘটতো না!

বসে বসে এইসব ভাবছেন বোধিসত্ত্ব, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি।

অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, কাতারে কাতারে তক্ষশিলার মানুষ আসছে পান্থশালার দিকে। সঙ্গীতবাদ্যমুখর বিশাল শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসছে সুসজ্জিত রাজহস্তী। রাজহস্তীর পিছনে আসছেন রাজমন্ত্রী, কোটাল, সেনাধ্যক্ষ, সভাসদ্‌বর্গ, সৈন্যসামন্ত আর তক্ষশিলার বৃদ্ধ নাগরিকের দল।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর কথাই সত্য হলো। নগরময় অপরূপ সাজসজ্জা, নাচগান আর আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। সাত দিন সাত রাত্রি উৎসব-আনন্দে ডুবে রইল তক্ষশিলা।

# প্রথম কান্না

আজ সবাই কাঁদে। পৃথিবীতে আজ তাদের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী, জীবনভোর যাদের কান্নাই সার।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল—সে কোন্ আদ্যিকালে, কেউ বলতে পারে না—পৃথিবীতে যখন কান্না ছিল না। কেউ কাঁদতে জানতো না, কান্না কাকে বলে, তা-ও কেউ জানতো না। সবাই হাসতো, খেলতো, সুখে দিন কাটাতো। পৃথিবীতে তখন ছিল শুধু আলো আর ফুল, হাসি আর আনন্দ।

তারপর হঠাৎ একদিন সবাই কেঁদে উঠলো—পশুপাখি কাঁদলো, মানুষও কাঁদলো। আর সেই দিন থেকে কান্না এল পৃথিবীতে, এল অশ্রুর বন্যা।

কেন ?—বড় করুণ সে কাহিনী।···

## প্রথম কান্না

পাহাড়ে ঘেরা এক দেশ। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলে বনের ছায়া, পাহাড়ের নীচে বনের মায়া। মাঝে মাঝে সবুজ মখমলের মতো নরম ঘাসে বিছানো মাঠ আর ঝরনার গান। সেখানে ফুল ফোটে। পাখি ডাকে। রামধনু-রঙের পাখা মেলে ফুলে ফুলে ওড়ে প্রজাপতি। সেথা দিনের বেলায় রেণুর মতো সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে। আর রাতের বেলায় কে যেন তারার চাঁদোয়া টাঙায় উপরে। চাঁদনী জোছনায় আলোছায়া লুকোচুরি খেলে বনে আর মাঠে আর ঝরনার জলে।

মায়াময় সে এক স্বপনপুরী।

সেখানে বাস করে এক হরিণী—তার বাচ্চাটিকে নিয়ে। বড় সুখে সে থাকে। সাত রাজার ধন এক মানিক তার ওই ছেলেটি। কাঁচা হলুদের মতো তার গায়ের রঙ, মাঝে মাঝে গোল গোল সোনালী ডোরা আর কপালে সাতরঙা এক চক্রের মাঝে অপরূপ এক শুভ্র কমল। আলো যেন ঠিকরে পড়ে শিশুর গা থেকে। দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। হরিণ-শিশু তো নয়—যেন এক হীরের টুকরো দেবশিশু।

ছেলেকে নিয়েই হরিণীর দিন কাটে। দিনের বেলায় সে ছেলের পাশে পাশে ঘোরে, একদণ্ড কাছছাড়া করে না। আর রাতের বেলায় তাকে কোলের মাঝে নিয়ে ঘুমায় পরম সুখে। ছেলে যখন মাঠের মাঝে লাফালাফি করে, নিজের ছায়া আর বনের হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করে বেড়ায়, মা তখন ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ছেলের গরবে বুক তার ভরে ওঠে।

এমনিভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন হরিণী দেখলো, ছেলে যেন কেমন আনমনা—খেলাধুলো করে না, দৌড়ঝাঁপে মন নেই। মা জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে রে?"

আনমনে ছেলে জবাব দিল, "কিছু না।"

এক দিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিনের দিন ছেলে হঠাৎ বললে, "মা, আমি পাহাড়ের ওপারে যাব। ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, কত ঘাস, কত মিষ্টি লতাপাতা।"

মা চমকে উঠলো, "এ্যাঁ! কোথায়? কি বলছিস?"

ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে বললে, "কেন? ওই ওখানে।"

"ওখানে? হঠাৎ ওখানে তুই যাবি কেন?"

ছেলে বললে, "ঐ তো বললাম—ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, মাঠভরা মিষ্টি ঘাস, লতাপাতা আর ভারি মিষ্টি ফুলফল।"

মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। বললে, "কে বললে? কে বললে তোকে এই সব মিছে কথা?"

মায়ের কোল ঘেঁষে ছেলে বললে, "অমন করছো কেন, মা? মিছে কথা কেন হবে? তুমি জানো না, তাই বলছো। সেই যে বনের টিয়া মাসী—সে-ই তো বলেছে ওই দেশের কথা। মাসী রোজ যায় সেখানে। আমিও যাব মা।"

মা বলে, "না, না।"

ছেলে বলে, "কেন না করছো, মা? একটি বার—শুধু একটি বার যাব। গিয়েই ফিরে আসবো তখ্‌খুনি।"

মায়ের মন হু-হু করে ওঠে; বলে "ওরে, না না, যাস নে—কখ্‌খনো যাস নে ওখানে। যা শুনেছিস, সব মিছে কথা।"

মা কত বুঝায়, কত নিষেধ করে। কিন্তু ছেলের সেই এক গোঁ—একটি বার গিয়েই সে ফিরে আসবে।

মায়ের বুকে সে মুখ ঘষে আর বারবার বলে, "একবার যেতে দাও, মা—শুধু একটি বার। গিয়েই ফিরে আসবো। টিয়া মাসী বলেছে, ভারি সুন্দর সে দেশ, সেখানকার সবই মিষ্টি।"

কি বলে ছেলেকে ভুলোবে, কি করে তাকে নিরস্ত করবে, হরিণী ভেবে পায় না। বনের দিকে অসহায় ডাগর ছুই চোখ তুলে মনে মনে বলে, 'ওরে টিয়া সর্বনাশী! এ তুই কি করলি?'

দিন যায়।

ছেলে খায় না, দায় না। হাসে না, খেলে না। শরীর তার রোগা হয়, গায়ের রঙ মলিন হয়। অভিমানে মুখ শুকনো করে সে চুপ করে বসে থাকে।

হাজার হোক মায়ের মন তো—আর কত সহ্য হয়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষে মা একদিন বললে, "ওরে একগুঁয়ে, ছাড়বি না যখন, তখন যা। কিন্তু কথা দে—

গিয়েই চলে আসবি,
কোনো কিছুতেই মুখ দিবি নে,
এক নজর দেখেই ফিরে আসবি।—বল্। কথা দে।"

ছেলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মুহূর্তের তর সয় না। মায়ের কথায় সায় দিয়ে সে ছুটলো তখুনি। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ছেলে অদৃশ্য হতেই হরিণীর বুক সেই প্রথম যেন কেমন করে উঠলো। আকুল কণ্ঠে সে ডেকে উঠলো, "ওরে, ফিরে আয়, ফিরে আয়!"

প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। হরিণীর মনে হয়—যেন কতক্ষণ! কী এক অব্যক্ত অনুভূতিতে সে ছটফট করতে থাকে। বারে বারে কান খাড়া করে তাকায় পাহাড়ের দিকে—তার খোকা গেছে যেদিকে।

শেষে আর থাকতে না পেরে অধীর পায়ে সে এগোয় সেই দিকে।

হরিণ-শিশু তখন ছুটে চলেছে, ছুটছে যেন এক আলোর শিখা—কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন রইল পিছনে পড়ে, পিছনে রইল পাহাড়ের সারি। এক লাফে সে পার হলো রূপালী ঝরনা।

মনের আনন্দে নাচতে নাচতে শিশু ছুটে চললো তীরের মতো।

তারপর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো এক সময়ঃ সামনে এক নতুন দেশ!

শিশুর চোখ জুড়িয়ে যায়ঃ আহা! কী সুন্দর! এমন দেশ তো সে আগে কখনো দেখে নি। আহা কী রূপ! মাঠে মাঠে নাম-না-জানা কতো বড় বড় ঘাস! সোনালী, হলুদ, সবুজ—কতই না তাদের রঙের বাহার!

মুগ্ধ শিশু এগিয়ে যায়ঃ আঃ! কী সুগন্ধ ওদের!

তার চোখে যেন পলক পড়ে নাঃ চারিদিকে সুন্দর সব রসাল লতাপাতা! গাছে গাছে মনমাতানো কত ফুলফল! নিশ্চয়ই এই সেই দেশ, টিয়া মাসী বলেছে যে দেশের কথা।

শিশু আত্মহারা। মায়ের নিষেধ সে ভুলে গেল। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তারপর মাঠে গিয়ে নামলো।

তার জিভে জল, চোখ আনন্দে চঞ্চল।

হঠাৎ তার কানে এল এক খসখস শব্দ। ধনুকের মতো নরম ঘাড় তুলে সে তাকালো এদিক-ওদিক। তারপর—মুখ দিল ঘাসের মাথায়।

আবার সেই খসখস! এবার আরো কাছে। আর মাঠের পাশে ও গাছের তলায় কাদের যেন ফিসফাস।

শিশু এবার ঘাড় তুলে তাকালো ডাইনে। নিষ্পাপ দুই গভীর কালো চোখে ভয়ডর নেই, আছে বিস্ময় আর আনন্দ। দেখলো, কারা যেন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ চরণে। অদ্ভুত তাদের দেখতে—তারা দু পায়ে চলে, কি যেন ধরে আছে সামনের দু পায়ে।

শিশু তাকালো বাঁয়ে। তাকালো পিছনে।

ওরা সবখানে।

নির্বোধ শিশু জানে না,—ওরা মানুষ, হাতে ওদের তীর-ধনুক।

বড় বড় কৌতূহলী চোখে সে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত সেই জানোয়ারগুলোর দিকে।

এমন সময় হঠাৎ এক টঙ্কার—আর শন্ শন্ শন্! বাতাস যেন কেঁপে উঠলো।

পরক্ষণে তুলোর মতো নরম শিশু আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো, পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় ছটফট করে একবার শুধু ডেকে উঠলো—মা! মা!

তারপর সব শেষ। নিষ্পাপ শিশুর রক্তে সেই বুঝি পৃথিবী প্রথম রাঙা হলো।

## প্রথম কান্না

সেই মুহূর্তে হরিণীও এসে দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের চূড়ায়—নীল আকাশের গায়ে এক পটে-আঁকা ছবির মতো। তীরের ফলার মতো তার কানে এসে বিঁধলো ছেলের আর্তনাদ—মা! মা!

বিদ্যুদ্‌বেগে হরিণী ঘুরে দাঁড়াতেই, সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কেঁপে উঠলো। আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে সে আছাড় খেয়ে পড়লো পাথরের উপর। কেঁদে উঠলো হাহাকার করে। তার বুকের রক্তে পাথর রাঙা হয়ে গেল। সেই প্রথম মায়ের চোখের জলে আর বুকের রক্তে সিক্ত হলো কঠিন পাষাণ।

পরক্ষণে হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি জেগে উঠলো আকাশে বাতাসে। গাছপালা কেঁদে উঠলো। পশুপাখি কেঁদে উঠলো। আর—সাঁঝের আঁধারে মানুষও কেঁদে উঠলো ঘরে ঘরে।